ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

যোগাযোগ ও গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য

জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ক হ্যান্ডবুক

যোগাযোগ ও গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন
বিষয়ক হ্যান্ডবুক

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০১৮

পুনর্মুদ্রণ: মার্চ ২০২২

(হ্যান্ডবুকটি ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বার্লিনস্থ সচিবলায় থেকে এপ্রিল ২০১৭– এ প্রকাশিত ইংরেজি সংস্করণের বাংলা রূপান্তর হিসেবে টিআইবি কর্তৃক প্রণীত)

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

বাংলা সংস্করণ

মো. মাহফুজুল হক
প্রোগ্রাম ম্যানেজার

ইলমা হক
প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরোনো), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: +৮৮০২ ৪৮১১৩০৩২-৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: +৮৮০-২ ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

Supported by:

Federal Ministry
for the Environment, Nature Conservation,
Building and Nuclear Safety

based on a decision of the Parliament
of the Federal Republic of Germany

মুখবন্ধ

দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও টেকসই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৬ সাল থেকে কাজ করছে। এ উদ্দেশ্য অর্জনে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে গবেষণা এবং অ্যাডভোকেসির পাশাপাশি অংশীজনের সক্ষমতা এবং দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে নাগরিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। টিআইবির দীর্ঘ পঁচিশ বছরের অধিক সামগ্রিক কার্যক্রমে এবং বিভিন্ন অর্জনের সহযাত্রী হিসেবে গণমাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে টিআইবি ১৯৯৯ সাল থেকে প্রতি বছর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ও ফেলোশিপসহ জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে যোগাযোগ ও গণমাধ্যমকর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করে আসছে।

বৈশ্বিকভাবে, বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের পথে জলবায়ু পরিবর্তন একটি বড় প্রতিকূলতা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। একইসাথে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সুশাসনের ঘাটতিসহ নাগরিক সম্পৃক্ততায় বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনকে টিআইবি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ খাতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের গণমাধ্যমকর্মীদের সম্পৃক্ত করে টিআইবি ২০১৫ সাল থেকে জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক কার্যক্রম ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্র এবং কৌশল চিহ্নিত করাসহ প্রতিবেদন প্রকাশে করণীয় নির্ধারণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। একইসাথে টিআইবি ২০১৬ সাল থেকে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ফেলোশিপ চালু করেছে।

অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনে নাগরিক সম্পৃক্ততা আরও জোরদার করার লক্ষে ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত টিআইবির আয়োজনে জলবায়ু অর্থায়ন এবং এ খাতে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের এক কর্মশালায় প্রথম গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য একটি হ্যান্ডবুক তৈরির ধারণা উত্থাপিত হয়। কর্মশালায় উপস্থিত অংশীজনেরা গণমাধ্যম কর্মীদের কাছে জলবায়ু অর্থায়ন এবং সুশাসনের বিষয়টিকে আরও সহজভাবে উপস্থাপনের জন্য এ বিষয়ক একটি সহায়িকা প্রস্তুতের পরামর্শ দেন। সেই প্রেক্ষিতে “জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ে যোগাযোগ ও গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য হ্যান্ডবুকটি টিআইবি, টিআই কেনিয়া, মেক্সিকো, পেরু এবং মালদ্বীপের এ বিষয়ক বহুবিধ কার্যক্রমলব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সচিবলায় কর্তৃক ইংরেজিতে এপ্রিল ২০১৭ প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। পরবর্তিসময়ে বাংলা ভাষার পাঠকদের সুবিধার্থে হ্যান্ডবুকটি টিআইবি কর্তৃক বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে। ইংরেজি ভাষা থেকে সহজবোধ্যভাবে বাংলায় রূপান্তর করার সুবিধার্থে কিছু পরিভাষা এবং অনুচ্ছেদ পরিমার্জন করে প্রণীত হয়েছে। তবে মূল বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত রাখতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এই হ্যান্ডবুকটির সকল তথ্য ডিসেম্বর ২০২২ সাল পর্যন্ত হালনাগাদকৃত।

আমি আশাকরি সহায়িকাটি গণমাধ্যমকর্মী তথা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ক টিআইবি কার্যক্রম এবং এই হ্যান্ডবুক সংক্রান্ত আপনাদের যে কোনো সুচিন্তিত মন্তব্য ও গঠনমূলক পরামর্শকে আমরা স্বাগত জানাই।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

সূচনা	০৯
জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থায়ন বিষয়ে সংশয় ও ভ্রান্ত ধারণা থেকে সতর্কতা	১৫
জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা	১৯
জলবায়ু অর্থায়ন: প্রতিবেদন তৈরির ধারণা ও কিছু কেস স্টাডি	২৫
জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান	৩১
যোগাযোগ ও গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য কর্মশালা আয়োজনের কৌশল বা “স্টার্টার প্যাক”	৪১
জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন	৪৯
জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিভাষা ও শব্দকোষ	৫৫

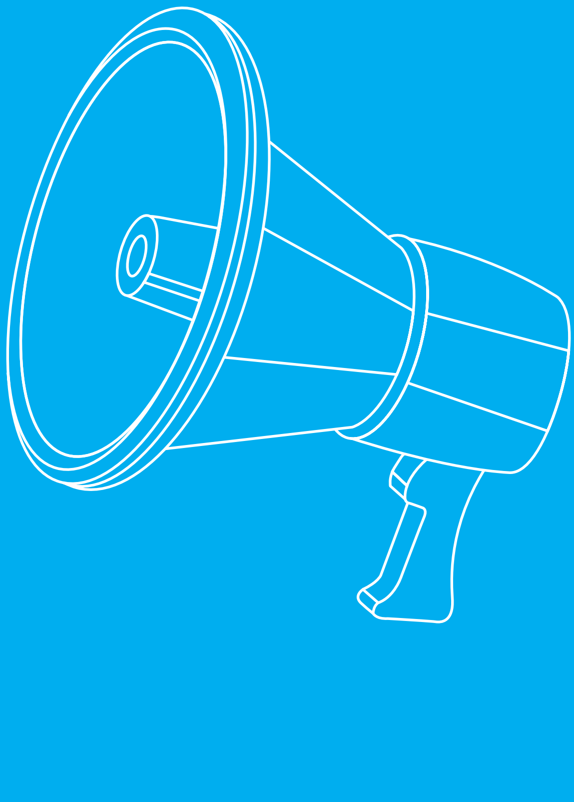

সূচনা

সূচনা

> আমাদের ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে,
> মেরামতের জন্য অর্থ বরাদ্দ ছিল,
> কিন্তু কেউ তা মেরে দিয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জীবনযাত্রা হুমকির মুখে থাকলেও
সহায়তার শত শত কোটি ডলার যাদের কাছে পৌঁছায়নি,
ওপরের মন্তব্যটি তাদেরই অভিজ্ঞতার বাস্তবচিত্র।

এমন ভুক্তভোগীদের কাহিনী খুঁজে বের করে সবাইকে বলা জরুরি, কিন্তু সবসময় তা সহজ নয়।

এই হ্যান্ডবুকটি এই ক্ষেত্রে যোগাযোগ ও গণমাধ্যম কর্মীদের সাহায্য করবে।

ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)–এর আয়োজনে ঢাকায় জলবায়ু অর্থায়ন এবং এ খাতে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের কর্মশালায় প্রথম এই হ্যান্ডবুক তৈরির ধারণাটি আসে। কর্মশালায় উপস্থিত বেশির ভাগ মানুষই ছিলেন জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে হুমকিতে থাকা দেশগুলোর নাগরিক। নদীমাতৃক বাংলাদেশ, সাগরবেষ্টিত মালদ্বীপ, সেখান থেকে সুদূর আফ্রিকার কেনিয়া– সবাই অভিন্ন এক চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন যার সম্ভাব্য পরিণতি ভয়ঙ্কর। আজকের প্রজন্মের কাছে জলবায়ু অর্থায়ন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় এবং ভবিষ্যতের প্রজন্মের কাছে তার গুরুত্ব আরও বেশি। তথাপি জলবায়ু পরিবর্তন ও এই খাতে অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের আগ্রহী করা অনেক সময় খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

কেন কঠিন তা খুব সহজেই বোঝা যায়। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে যে সব গণমাধ্যম ও যোগাযোগকর্মীরা কাজ করছে তারা গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের মতো কারিগরি বিষয়গুলোকে সকলের জন্য বোধগম্য করতে এবং চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে সক্ষম হলেও একটি মূল সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে আর তা হলো– সমস্যা কেন্দ্রিক আলোচনার ভিতরে আমরা আটকে আছি। তাই এখন সমস্যাগুলো সমাধানের জন্য আমাদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে, যার শুরু হতে পারে জলবায়ু অর্থায়ন থেকে।

তবে চ্যালেঞ্জটা বেশ বড়, ২০২০ সাল থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে উন্নত দেশগুলোর সরকারেরা জলবায়ু খাতে অর্থায়নের জন্য প্রতি বছর একশ বিলিয়ন ডলার অর্থের যোগান দেওয়ার অঙ্গিকার করলেও ২০২১ সালে এসেও তা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে। এছাড়া, এই অর্থ কীভাবে ব্যয় হয় তার ওপরই নির্ভর করছে কোটি কোটি মানুষের জীবন ও জীবিকার ভবিষ্যৎ এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা।

অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি এখনো দুর্বল। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশ্বের সর্বোচ্চ হুমকিতে থাকা কয়েকটি দেশের অবস্থা টিআই এর দুর্নীতি ধারণা সূচক অনুযায়ী অত্যন্ত খারাপ।[১]

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় শত শত কোটি ডলার তহবিল সংগ্রহের বৈশ্বিক প্রচেষ্টা দুর্নীতির ঝুঁকিতে রয়েছে। এ ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টিতে বিশ্বজুড়ে সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় অর্থায়ন এবং দুর্নীতির বিষয়টিকে বেশি কারিগরি বা কঠিন ভাবার কোনো কারণ নেই। বাস্তব জীবনে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বা দুর্নীতির মুখোমুখি হলে যে কারও ক্ষোভ ও ভয় বা এই দুইটি অনুভূতিই সৃষ্টি হতে পারে। এই সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করতে অনেকেই ত্যাগ স্বীকার করেছেন, আবার অনেকেই তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্নীতি মোকাবেলা করার অর্থ হচ্ছে, এই বিশ্ব ও বিশ্বের মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় দুই হুমকি মোকাবেলা করা। আমাদের এক সহকর্মী, ভানিয়া মোনতালভো (ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল মেক্সিকো) যেমনটা বলেন[২]:

> ‘জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্নীতির লক্ষণগুলোর মধ্যে কিছু মিল রয়েছে। এ দুটোই দরিদ্রতমদের ওপর সবার প্রথমে এবং সবচেয়ে মারাত্মকভাবে আঘাত হানে। স্বল্প সময়ে লাভবান হতে চান সমাজের এমন প্রভাবশালী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কারণেই এ দুইয়ের উৎপত্তি। দীর্ঘমেয়াদে, এ দুই সমস্যা জীবন-জীবিকাকে ঝুঁকিতে ফেলে এবং পুরো অর্থনীতির জন্য হুমকি হয়ে ওঠে। যা সরকারের ভুলত্রুটির সুযোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর তাই এই ঝুঁকি মোকাবেলায় শক্তিশালী বৈশ্বিক সহযোগিতার প্রয়োজন।’

১ http://www.transparency.org/research/cpi/overview
২ https://www.devex.com/news/in-mexico-tackling-climate-change-starts-with-corruption-86574

ঢাকায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় জলবায়ু অর্থায়নের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সাংবাদিক, পরিবেশবাদী ও পর্যবেক্ষণকারী সংস্থার কর্মীদের সহযোগিতায় এই হ্যান্ডবুক তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এই হ্যান্ডবুকটি বিশেষত সেইসব এনজিও কর্মী, যোগাযোগ ও গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য যারা জলবায়ু পরিবর্তন এবং জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিতের বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন কিন্তু নিজেদের ব্যস্ততা এবং একাধিক বিষয় নিয়ে কাজ করার ফলে এ সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলো সহজ করে উপস্থাপন করার পেছনে যথেষ্ট সময় দিতে পারেন না।

জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন অথবা এই হ্যান্ডবুক সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্যে যোগাযোগ করুন : info@ti-bangladesh.org

জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থায়ন বিষয়ে সংশয় এবং ভ্রান্ত ধারণা থেকে সতর্কতা

জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থায়ন বিষয়ে

সংশয় এবং ভ্রান্ত ধারণা থেকে সতর্কতা

জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে সংশয় এড়াতে প্রচারণা কাজে নিচের বার্তাগুলো থাকা উচিতঃ

- জলবায়ু অর্থায়ন মূলত ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভুক্তভোগীদের জীবন ঘনিষ্ট ও অস্তিত্বের প্রশ্নের সাথে যুক্ত
- দুর্নীতি ঠেকাতে নাগরিক সমাজ এবং সরকারগুলো ইতিমধ্যেই অনেক কাজ করেছে এবং আরও অনেক কিছু করার সামর্থ রয়েছে
- দুর্নীতিকে চ্যালেঞ্জ জানানো এবং দুর্নীতির পথগুলো বন্ধ করা

বার্তাগুলো কেন থাকা উচিত?

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা তৈরির প্রচারণাকে সবসময়ই (বর্তমানে ও ভবিষ্যতের) একটি বড় বাঁধার মুখে পড়তে হবে। আর তা হচ্ছে জলবায়ু যে পরিবর্তন হচ্ছে এই সত্যকেই অস্বীকার করা। সাধারণত রাজনৈতিক কারণে বা ব্যবসায়িক স্বার্থে এই সত্যকে অস্বীকার করা হয়ে থাকে। তবে বহুভাবেই এই অস্বীকার করা বা গুরুত্ব না দেওয়ার ব্যাপারটা ঘটতে পারে। যেমন, আমরা হয়তো ভুলভাবে বিশ্বাস করছি, জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে, তবে তা মানুষের কারণে নয়। অথবা আমরা হয়তো বিশ্বাস করছি, এটা ঘটছে তবে তা ততোটা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় নয়। কিংবা হয়তো মনে করছি, জলবায়ুর পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য মাত্রায়ই ঘটছে বটে, তবে তা "প্রকৃতির শক্তির" তুলনায় এমনভাবে না যে, মানুষকে এ জন্য ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ নিতে হবে। আবার, কেউ হয়তো এটাও বিশ্বাস করতে পারেন, জলবায়ু পরিবর্তন মানবসৃষ্ট ঠিকই, তবে এই পর্যায়ে এসে বিপর্যয়ের পথ থেকে ফেরা সম্ভব কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

দুঃখজনকভাবে জলবায়ু অর্থায়নই জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত আলোচনাগুলোর মধ্যে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক বিতর্কের শিকার। আর জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হচ্ছে আর সেই সাথে চলছে বিতর্ক।

আমরা লক্ষ করলে দেখব, এই প্রবণতা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থাগুলোর আচরণের মধ্যে বিদ্যমান। বেশিরভাগ উন্নত দেশ যারা জলবায়ু অর্থায়ন করে থাকে তাদের মধ্যে একটি মহল এই অর্থায়নের যথার্থতা এবং উপকারভোগীদের যোগ্যতা নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রশ্ন তুলছে। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক মহল ও সংবাদমাধ্যমের একটি অংশ– ডেইলি মেইল একটি আদর্শ উদাহরণ, যে পত্রিকাটি যুক্তরাজ্যে সরকারের সহযোগিতা সংস্থা ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের (ডিএফআইডি)-এর কার্যক্রমের অনুমানভিত্তিক ভুল ধরতেও সদা তৎপর।

ডেইলি মেইল এর মনোভাব জলবায়ু অর্থায়নের বিপক্ষে। যুক্তরাজ্যের করদাতাদের অর্থে বাংলাদেশের বন্যা মোকাবেলার মতো প্রকল্পের খরচ যোগানো তাদের পছন্দ নয়। (তাদের মত কী! তা জানতে আগ্রহী হলে এই আর্টিকেলটি দেখুন)[৩]

২০১৭ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই সমস্যা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। তার আমলে প্যারিস চুক্তি থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বের হয়ে যায় এবং জলবায়ু খাতে অর্থায়ন বন্ধ রাখে। ডোনাল্ড ট্রাম্প জনসমক্ষেই জলবায়ু পরিবর্তনকে ধাপ্পাবাজি আখ্যা দিয়ে বলেছেন 'মার্কিন পণ্য উৎপাদন এবং মার্কিন পণ্যের, পণ্যবাজারে প্রতিযোগিতার সক্ষমতা কেড়ে নিতে চীন জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি নিজেদের কাজে লাগানোর জন্য সৃষ্টি করেছে'।

এসব বিবেচনায়, জলবায়ু অর্থায়নের পক্ষের প্রচারকারীদের দায়িত্ব হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনকে যারা অস্বীকার করেন তাদের ফাঁদে না পড়া। তবে অবশ্যই এ খাতে দুর্নীতি, অবহেলা ইত্যাদির ওপর আলোকপাত করতে হবে। যারা জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে এই সত্যকে অস্বীকার করে তারা হয়তো দুর্নীতির বিষয়গুলোকে সার্বিকভাবে জলবায়ু অর্থায়নের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরবে। কিন্তু সচেতনভাবে সবাইকে জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের বিষয়টিকে সব সময় নজরদারির মধ্যে রাখতে হবে।

আমাদের জোগাড় করা তথ্যপ্রমাণ এবং আমার বলা বিষয়গুলো বিকৃত করে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করা যার লক্ষ্য, তাকে পুরোপুরি রুখে দেওয়া কখনোই সম্ভব নয়। তবে কার্যকর তথ্য ও প্রমাণ সরবারহ করার মাধ্যমে আমাদের কথা বা লেখায় সেই সংশয় দূর করা সম্ভব। মূল বিষয় হলো, জলবায়ু অর্থায়ন যাতে আরও ভালোভাবে কাজ করে আমরা সেজন্যই এর সাথে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতিগুলোর ওপর আলোকপাত করতে চাই। মনে রাখতে হবে জলবায়ু অর্থায়ন একটি অনর্থক পরিকল্পনা বলে যারা প্রচার করে তাদের হাতে রসদ তুলে দেওয়া এই আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। বরং আমাদের কাজ এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

কাজের সুবিধার্থে যে-সকল তথ্য আমাদের মনেরাখা ও প্রচার করা দরকার:

১. জলবায়ু অর্থায়ন আমাদের কাছে জীবন-মরণ বিষয়
২. দুর্নীতি ঠেকাতে সুশীল সমাজ এবং সরকারগুলো ইতিমধ্যেই অনেক করছে এবং তাদের আরও অনেক কিছু করার সামর্থ্য রয়েছে
৩. দুর্নীতির বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করা এবং দুর্নীতির পথগুলো বন্ধ করা জরুরি

[৩] http://www.dailymail.co.uk/news/article-3614562/Up-smoke-paid-quad-bike-cut-carbon-dioxide-Bangladesh-spending-7billion-five-new-coal-fired-power-stations.html

জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা

জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা

সহজ ভাষায় জলবায়ু অর্থায়ন খাতে সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা কী?

জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবেলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ কিছু সরকারি ও বেসরকারি কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার মধ্যে সরকার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানির অংশীজনেরা জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুশাসন ও ব্যবস্থাপনার নিশ্চিতে সক্রিয় দায়িত্ব পালন করেন। অংশীজনদের এই সমন্বিত প্রচেষ্টাকে সার্বিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তন খাতে সুশাসন ও ব্যবস্থাপনা বলা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই অংশীজনদের কাজ হলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অর্থায়ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ এবং তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন।

অন্যদিকে সহজ ভাষায়, জলবায়ু অর্থায়ন হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধ ও এর নেতিবাচক প্রভাবগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকিতে থাকা দরিদ্র দেশগুলোকে কার্বন নিঃসরণকারী ধনী দেশগুলোর (জলবায়ু পরিবর্তনে যাদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি) অর্থ দেওয়ার অঙ্গীকার। (তবে শব্দকোষে এর সংজ্ঞায় সূক্ষ্ম ভিন্নতা আছে)

সাধারণত তিন ধরনের জলবায়ু অর্থায়নের ব্যাপারে আলোচনা হয়ে থাকে:

- জলবায়ু প্রশমন খাতে অর্থায়ন– এর মানে হচ্ছে সেইসব প্রকল্পে অর্থায়ন করা, যা জলবায়ু পরিবর্তনের উৎসকে সীমিত করার মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে হ্রাস করে এবং প্রশমনে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প, নতুন বনায়ন উদ্যোগ এবং অন্যান্য কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা।
- অভিযোজন অর্থায়ন– হলো সেইসব প্রকল্পে অর্থায়ন করা, যেগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপন্ন মানুষকে পরিবর্তিত পরস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে বা মানিয়ে নিতে সহায়তা করবে। উদাহরণ: সমুদ্রতীরবর্তী বাঁধ বা ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ।
- রিডিউস ইমিশন ফ্রম ডিফরেস্টেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশন (REDD+)– অর্থাৎ বন সুরক্ষা ও নতুন বনায়নে বিনিয়োগ করা যা কখনো কখনো কার্বন বাজারে কার্বন ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে হতে পারে।

জলবায়ু অর্থায়ন কথাটা শুনতে কিছুটা আন্তর্জাতিক সহায়তার মতো শোনায়। এটা কি আসলেই কোনো সহায়তা?

জলবায়ু অর্থায়ন মোটেই আন্তর্জাতিক সহায়তা নয়। জলবায়ু অর্থায়নের সংজ্ঞা জাতিসংঘ কনভেনশনগুলোতে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং এখানে সংজ্ঞাতে সহায়তা ও জলবায়ু অর্থায়নের মধ্যে সুস্পষ্ট ও সচেতনভাবে পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে।

এর পেছনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি আছে। জাতিসংঘের ভাষায়, জলবায়ু অর্থায়ন অবশ্যই উন্নয়ন সহায়তা (অফিসিয়াল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্স) এবং এসংক্রান্ত প্রতিশ্রুত অর্থের চেয়ে "নতুন এবং বাড়তি" হতে হবে। এ অর্থ অবশ্যই সুনির্দিষ্টভাবে জলবায়ু বিষয়ক প্রকল্প এবং কার্যক্রমের জন্যই প্রতিশ্রুত হতে হবে। (তবে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায়ই আন্তর্জাতিক সহায়তা ও জলবায়ু অর্থায়নকে আলাদা করা খুব কঠিন হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে স্বচ্ছতা আনতে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। এ বিষয়টি নিচে আলোচনা করা হয়েছে।

জলবায়ু অর্থায়ন কি শুধু সরকারের কাছ থেকেই আসে?

জলবায়ু অর্থায়ন সরকারি বা বেসরকারি যে কোনো সূত্র থেকে আসতে পারে। উন্নত দেশগুলোকেই শুধু জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সহায়তা প্রদানের কথা বলা হলেও বেসরকারি খাত থেকেও অর্থায়ন আসতে পারে। অনেকেই আমরা হয়তো "লিভারেজড" জলবায়ু অর্থায়নের কথা শুনেছি। এ ক্ষেত্রে প্রথমে সরকারি অর্থায়নে একটি প্রকল্প দাঁড় করানো হয়। আর্থিকভাবে টেকসই হওয়ার পর এতে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোও বিনিয়োগ করে। জলবায়ু বিষয়ে ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আরও জানতে শব্দকোষের "কার্বন বাজার" ও "লিভারেজ" অংশ দেখুন।

কী পরিমাণ অর্থ এখানে যুক্ত?

জাতিসংঘের লক্ষ্য ২০২০ সাল নাগাদ বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার জলবায়ু অর্থায়ন "যোগাড় করা"। এখানে "যোগাড় করা" কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। এই যোগানের অর্থ হলো, উন্নত দেশের সরকারগুলোকেই (আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের জলবায়ু তহবিলসহ) বিভিন্ন তহবিল গঠনের মাধ্যমে এই অর্থ জোগাড়ে নেতৃত্ব দিতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যা হল সরকারি এবং বেসরকারি কোন খাত থেকে অর্থের কত অংশ আসবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়নি। এই ১০০ বিলিয়ন ডলারের ব্যবস্থাপনা গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের (জিসিএফ) এর মত বিশেষায়িত তহবিলের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে।[৮] ২০১৫-২০২১ পর্যন্ত জিসিএফ কর্তৃক ১৯০টি প্রকল্পে ১০বিলিয়ন ডলার অনুমোদনের বিপরীতে দুই বিলিয়ন ডলার ছাড় করা হয়েছে। জিসিএফ থেকে প্রকল্প তহবিল

৮ https://www.greenclimate.fund/projects/portfolio

কী পরিমাণ অর্থ এখানে যুক্ত?

ছাড় এবং বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোতে ক্ষয়-ক্ষতি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই তহবিলের অর্থ ৫০ঃ৫০ অনুপাতে অভিযোজন এবং প্রশমন কাজে ব্যয় করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।[৫] কিন্তু ২০২১ সাল পর্যন্ত অভিযোজনের জন্য ২ দশমিক ৪ বিলিয়ন (২৪ শতাংশ) প্রশমনের জন্য ৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন (৪৫ শতাংশ) প্রশমন ও অভিযোজন মিলিয়ে ৩.১ বিলিয়ন (৩১ শতাংশ) প্রদান করা হয়েছে। লক্ষের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও জিসিএফই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় জলবায়ু তহবিল। ২০২২ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত অর্থায়নকারি দেশগুলোর কাছ থেকে এই তহবিলে ১০ বিলিয়ন ডলার জমা পড়েছে।

তবে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডই একমাত্র জলবায়ু তহবিল নয়। তাই প্রধান জলবায়ু তহবিলগুলো সম্পর্কে আরও জানতে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বিষয়ে অধ্যায়টি দেখুন।

অর্থ দেবে কে?

উন্নতদেশগুলো নীতিগতভাবে জলবায়ু অর্থায়নে অবদান রাখতে সম্মত হলেও কে কত অর্থ দেবে বা কে কত অর্থ পাবে– সে ব্যাপারে কোনো নির্দেশনা নেই। এ কারণে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়টি অনেকটাই অনিশ্চিত। অক্সফাম এক সময় গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডে ১৫ বিলিয়ন ডলার তোলার প্রতিশ্রুতির সত্যতা যাচাই করতে বিশ্বের সবচেয়ে দূষণকারী দেশগুলোর প্রদেয় "ন্যায্য অর্থের" একটি হিসাব তৈরির চেষ্টা করেছিল। এবিষয়ে বিস্তারিত জানতে এখানে পড়ুন।[৬]

---

৫ https://www.greenclimate.fund/projects

৬ http://politicsofpoverty.oxfamamerica.org/2014/06/talking-dollars-cents-big-questions-green-climate-fund/

জলবায়ু অর্থায়ন:
প্রতিবেদন তৈরির ধারণা ও কিছু কেস স্টাডি

জলবায়ু অর্থায়ন: প্রতিবেদন তৈরির ধারণা ও কিছু কেস স্টাডি

কেস স্টাডি

এই অধ্যায়ে জলবায়ু ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের ভুল-ত্রুটির কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরা হবে। প্রতিটি ঘটনার বর্ণনায় যেসব অংশ চিহ্নিত মোটা বাক্যাংশে বা শব্দে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোতে দুর্নীতি, অযোগ্যতা ও দায়বদ্ধতার অভাবের চিত্র একাধিকবার উঠে এসেছে। এই উদাহরণগুলো জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখির ক্ষেত্রে কিছু সাধারণ ধারণা তুলে ধরেছে। এর পাশাপাশি কীভাবে এগুলো সংবাদ হতে পারে, তার সূত্র দেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য সমস্যাগুলোর বিষয়ে পরিপূর্ণ কোনো তালিকা এটি নয়, তবে মোটাদাগে কিছু নমুনা মাত্র।

সাংবাদিক বন্ধুরা, আপনারা যদি এ ধরনের সংবাদের সন্ধান করতে আগ্রহী হন তবে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন: info@ti-bangladesh.org

দেয়াল ছাড়াই ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র

২০১৫ সালে নিউজউইক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে নেওয়া হয়েছে[৭]:

ঘূর্ণিঝড় আইলার আঘাতের পর ২০১১ সালে বাংলাদেশ এর দক্ষিণ-পশ্চিমের উপকূলীয় এলাকায় "জলবায়ু সহিষ্ণু ঘরবাড়ি" নির্মাণে ৩১ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করে। ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর গবেষক দল প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে দেখতে পান, সেখানে কিছু ঘর নির্মিত হয়েছে যেগুলোর দেয়াল নেই। খাদিজা বেগম নামের এক স্থানীয় নারী বলেন, 'জানি না এসব বাড়ি কি মানুষ না অন্য কিছুর জন্য তৈরি করা হয়েছে।' বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অনুমোদিত নকশা মেনেই ওইসব ঘর তৈরি করা হয়েছিল। টিআইবি-এর গবেষণা প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, বেশি ঘর তৈরির কৃতিত্ব নেওয়ার জন্য সরকার নির্মাণের খরচ কে অর্ধেক করে দেয়াল ছাড়াই ঘর নির্মাণ করেছে। এবিষয়ে একটি সত্য ঘটনা জানতে ক্লিক করুন এখানে।[৮]

এছাড়া জলবায়ু তহবিলের অর্থে ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধক স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ প্রকল্পেও বিবিধ অনিয়ম এবং দুর্নীতির ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। ঝুঁকিতে থাকা জেলে পরিবার বসবাস করে এমন স্থানে স্কুল কাম সাইক্লোন সেল্টারটি নির্মাণ না করে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট একজন সরকারি কর্মচারী তার অনৈতিক প্রভাব ও ক্ষমতা ব্যবহার করে নিজের বাড়ির পাশে সেল্টারটি নির্মাণ করেছে। নির্মিত সেল্টারটির স্থানে বাস্তবে কোনো স্কুলের অস্তিত্ব না থাকায় সেটি অব্যবহৃত পড়ে রয়েছে। সেখানে কোনো শিক্ষা ও পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত করা হয় না। অন্যদিকে, সেল্টারটির সঠিক স্থানে স্থাপিত না হওয়ায় জেলে কমিউনিটিসহ ঝুঁকিপূর্ণ স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঝুঁকি মোটেই হ্রাস পায়নি। সেল্টার এ বিষয়ে একটি সত্য ঘটনা জানতে ক্লিক করুন এখানে।[৯]

---

[৭] http://europe.newsweek.com/green-climate-fund-must-fight-corruption-it-can-beat-global-warming-336209?rm=eu

[৮] http://www.transparency.org/news/story/no_shelter

[৯] https://www.transparency.org/en/projects/exporting-corruption/data/climate-governance-bangladesh

সুনামির ত্রাণের টাকা হাওয়া হয়ে গেল

নিচের অংশটুকু ট্রান্সপারেন্সি মালদ্বীপের নির্বাহী পরিচালক মরিয়াম সুইনার লেখা দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত একটি মতামতধর্মী কলাম থেকে নেওয়া হয়েছে[১০]:

২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আমরা দেখেছি কীভাবে বহুতল সমান উঁচু সাগরের ঢেউ আমাদের উপকূলে আঘাত করেছে। হাজার হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলেছিল সুনামি। আমাদের ছোট প্রবাল দ্বীপগুলোর মধ্যে কিছু দ্বীপ কয়েকদিন জলমগ্ন ছিল। এই ঘটনায় মারা যায় প্রায় ১০০ মানুষ। কয়েক বছর পর অভিযোগ ওঠে যে, দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তারা সুনামির ত্রাণের জন্য বরাদ্দ ১৬ লাখ মার্কিন ডলার আত্মসাৎ করেছে। এ ঘটনায় সরকারি কোষাগার ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে মামলার জন্য একটি প্রতিবেদন সরকারের শীর্ষ আইন কর্মকর্তার (প্রসিকিউটর জেনারেল অফিস) কাছে পাঠানো হয়। তবে খুব সামান্য অগ্রগতি হয়েছে। ঘটনাটিতে যারা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাদের অনেকেই ছাড়া পান। এ ধরনের ঘটনার প্রেক্ষিতে এমন ঢিলেঢালাভাব মালদ্বীপে নতুন কিছু নয়। এই দুর্নীতি বিষয়ক অভিযোগের প্রেক্ষিতে (ভুয়া কাগজপত্র তৈরি এবং নির্মাণ কাজের উপকরণ সরবরাহের মিথ্যা কার্যাদেশ দেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগ) আমাদের দুর্নীতি দমন কমিশন দৃশ্যত আরও বড় অংকের অর্থ লোপাট হওয়ার সন্দেহ করছিল। এ ক্ষেত্রেও কাগজপত্র খতিয়ে দেখে মামলা এগোতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে।

জলবায়ু খাতের অর্থ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহার

২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে জলবায়ু ও উন্নয়ন বিষয়ে কাজ করা গবেষকদের একটি দল "ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স" শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[১১] জলবায়ু তহবিল গঠনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের একেবারে প্রথম দিকের একটি উদ্যোগ ছিল এটি। প্রতিবেদনে জাপান সরকারের উদ্যোগে উজবেকিস্তানে একটি গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ইন্দোনেশিয়ায় দুটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের অর্থ জলবায়ু খাত থেকে দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করে। এ বিষয়ে জাপান সরকারের বক্তব্য ছিল, তাদের তৈরি ঐ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো অনেক বেশি পরিবেশবান্ধব। তারা ওই প্রকল্পে যুক্ত না হলে সেখানে অধিক দূষণ করে এমন বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হতে পারত। আর এটি জাপানকে তার মোট জলবায়ু অর্থায়নের পরিমাণ "বাড়িয়ে দেখানোর" সুযোগ করে দেয়। ওই গবেষকেরা লেখেন, কার্বন নিঃসরণ কমানোর প্রযুক্তি না থাকার ফলে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ালে বিপুল পরিমাণ গ্রিন হাউস গ্যাস সৃষ্টি হয়। এসব বিদ্যুৎ কেন্দ্র দীর্ঘদিন টেকে বলে দশকের পর দশক ধরে দূষিত জ্বালানি উৎপাদনের চক্র চালু থাকে।

গণমাধ্যম যখন জাপানের এ দুটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কথা জানতে পারল, তখন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অর্থায়নকে নতুন এবং অতিরিক্ত জলবায়ু অর্থায়ন হিসেবে দেখানো এবং এ ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা নিয়ে কারিগরি ইস্যুতে বিতর্কটি এক বৈশ্বিক আলোচনায় রূপ নিল। বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) "জলবায়ু তহবিলের অর্থে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: জাতিসংঘের আইনের ঘাটতি স্পষ্ট" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।[১২] এপির এই প্রতিবেদনে ইউএনএফসিসির নির্বাহী সচিব ক্রিশ্চিয়ানা ফিগেরেসের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। ফিগেরেস সেখানে বলেন, জাপান

---

[১০] http://www.independent.co.uk/voices/how-the-maldives-can-avoid-yet-another-corrupt-relief-effort-in-the-face-of-climate-change-a6718416.html

[১১] http://www.wri.org/sites/default/files/mobilising_international_climate_finance_final_0.pdf

[১২] http://bigstory.ap.org/article/07b1724c91604b0d8a3d272424912580/climate-funds-coal-highlight-lack-un-rules

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রায় ১০০ কোটি ডলারের ঋণকে যে জলবায়ু অর্থায়ন হিসেবে ধরেছে তা তিনি জানতেন না। ইউএনএফসিসির নির্বাহী সচিব বলেন, 'ভবিষ্যতের জ্বালানি ব্যবস্থায় অনিয়ন্ত্রিত কয়লা ব্যবহারের কোনো সুযোগ নেই।'

এ ঘটনার পরেও বিশ্বে জলবায়ু অর্থায়নের সবচেয়ে বড় তহবিল হিসেবে পরিচিত গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড এখন পর্যন্ত কয়লাভিত্তিক প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধের কথা নিশ্চিত করে বলতে পারেনি। অথচ পরিবেশবাদী বিভিন্ন সংগঠন এবং জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলছেন, গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস করার সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। তবে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড এখন গ্যাসের নিঃসরণ কমাতে ন্যূনতম একটি মাত্রা নির্ধারণ করে দিতে সম্মত হয়েছে।

ক্যামেরুনের বনাঞ্চলে হুমকি এবং উচ্ছেদ

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে ক্যামেরুনের অনেক আদিবাসীদের জীবন বননির্ভর। শিকার, খাদ্য সংগ্রহ, চাষাবাদের জন্য তারা বনের ওপরই নির্ভর করে। তবে সেখানে তারা টেকসই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে আসছে। যার অন্যতম উপায় হলো উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে কৃষিজমি কিছু সময়ের জন্য অনাবাদী ফেলে রাখা। ২০০৫ সালে ফরেস্ট কার্বন পার্টনারশিপ ফ্যাসিলিটি ক্যামেরুন সরকারকে টেকসই উন্নয়নের অর্থ সংস্থানের জন্য 'Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation-REDD' এর (শব্দকোষে ব্যাখ্যা দেখুন) আওতায় গৃহীত কর্মকাণ্ড অনুসরণ করার পরামর্শ দেয়। বিশ্বে নিজেদের "উদীয়মান অর্থনীতির দেশ" হিসেবে পরিচিত করতে ব্যগ্র ক্যামেরুন সরকার আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং কিছু বেসরকারি সহযোগী সংস্থার সঙ্গে মিলে দেশজুড়ে নানা REDD ও REDD+ কর্মসূচির পরিকল্পনা শুরু করে। জীববৈচিত্র্যের এক বিরাট আধার হিসেবে সুপরিচিত হলেও কৃষিকাজ এবং ব্যাপকহারে গাছ কেটে ফেলার কারণে দ্রুততার সাথে ক্যামেরুনের বন ধ্বংস হচ্ছে।

REDD কর্মসূচির আওতায় কিছু পাইলট প্রকল্প শুরু হওয়ার পর, এসব প্রকল্পের বিষয়ে স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা জানতে আদিবাসী অধিকারভিত্তিক সংগঠন ফরেস্ট পিপলস প্রোগ্রামের গবেষকেরা ক্যামেরুনের দুটি এলাকায় যায়। সেখানে তারা দুটি স্থানেই দেখেন,[১৩] প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত, আগাম ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামত নেওয়ার নীতিমালা থাকলেও প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন স্তরে তার ব্যত্যয় ঘটেছে। স্থানীয় আদিবাসীরাও মারধর ও উচ্ছেদেরও শিকার হয়েছেন।

একজন আদিবাসীর ভাষায়, 'আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই বনে অবাধে চলাফেরা করতে পারতেন এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমে কেন বনকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে ফেলা হচ্ছে তা বুঝতে পারছি না।' জার্মান উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থে বেতন পাওয়া প্রহরীরা কেন হঠাৎ বনবাসীর জীবনযাপনে বিঘ্ন সৃষ্টি করা শুরু করেছে, বনের অধিবাসিদেরকে কেউ তা বুঝিয়ে বলেনি। ২০১৪ সালে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'স্থানীয় প্রতিনিধিরা বলেছেন, কেউ তাদের সঙ্গে এ প্রকল্প নিয়ে কোনো আলোচনা করেনি; এমনকি তাদের জানায়নি পর্যন্ত।' প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, 'কোনো মতামত থাকা তো দূরের কথা, কার্যত স্থানীয় মানুষদের REDD কার্যক্রম সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই।' মোদ্দাকথা আদিবাসী মানুষদের REDD প্রকল্প সংক্রান্ত কোনো মিটিং সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত করা হয়নি এবং অনেক ক্ষেত্রে তাদের একেবারে বাদ রাখা হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড (ডব্লিউডব্লিউএফ) ক্যামেরুনে REDD প্রকল্পে এক কাঠ ব্যবসায়ী কোম্পানির সহায়তাকারী সংগঠন হিসেবে

[১৩] http://www.forestpeoples.org/topics/un-redd/publication/2014/deforestation-redd-and-takamanda-national-park-cameroon-case-study

কাজ করলেও প্রতিষ্ঠানটির এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, 'বাকা জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের REDD বোঝাতে গেলে আপনাকে অনন্তকাল ধরে অপেক্ষা করতে হবে।'

আদিবাসী মানুষদের সম্মতি না নেওয়া এবং সেই সঙ্গে কীভাবে কার্বন ট্রেডিংয়ের মুনাফার বণ্টন হবে এই বিষয়টি ২০১৬ সালেও অমীমাংসিত ছিল। তবে আন্তর্জাতিক সংগঠন সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনালের নির্বাহী পরিচালক স্টিফেন কোরি বলেন, 'ডব্লিউডব্লিউএফ যে পরিবেশের চিন্তার চেয়ে কর্পোরেট অর্থের যোগান নিশ্চিত করার ব্যাপারে বেশি আগ্রহী, এ নিয়ে যদি আরও প্রমাণ কেউ চায় তবে এই প্রতিবেদনই তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।'[১৪]

স্বচ্ছতার নিশ্চিতের জন্যে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের সাড়া

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) গঠনের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহারকে উৎসাহিত করার মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারে দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তনের উদাহরণ স্থাপন করা হলেও ২০১৫ সালের ৯ জুলাই সেই জিসিএফই ঘোষণা করে, বিশ্বে কয়লা খাতের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানটি তাদের অর্থ ব্যবস্থাপনা করবে।

জিসিএফের পরিচালনা বোর্ডের কাঙ্ক্ষিত সেই ব্যাংক হলো ডয়েচে ব্যাংক। এই প্রতিষ্ঠানটি নির্বাচনের বিষয়টি ঘটেছে একেবারে গোপনে। জলবায়ু খাতে অর্থায়ন পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এ সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সরব হয়। অ্যাকশন এইড ইউএসএর বিশ্লেষক ব্র্যানডন উ বলেন,[১৫] 'এ সিদ্ধান্ত মাথা গুলিয়ে দেওয়ার মতো' কারণ ডয়েচে ব্যাংক অর্থ বাজারে কারসাজি এবং অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত।

জলবায়ু সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অনেক সময় বেসরকারি ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে বেছে নেওয়া হয়। এসব প্রতিষ্ঠান তহবিল গ্রহণ ও বিতরণ এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করে। তবে খুব কম প্রতিষ্ঠানই আছে যাদের নিয়ে বিতর্ক নেই। তাই এই বিচারে বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এমন একটি বিষয়ে গোপন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলাই হয়তো জিসিএফের সবচেয়ে বড় ভুল। জিসিএফ জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান। ২০২০ সাল নাগাদ এই তহবিলে বছরে ১০০ বিলিয়ন ডলার বার্ষিক জোগাড়ের কথা রয়েছে। তবে জিসিএফ এখন পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোর কাছ থেকে জলবায়ু খাতে মাত্র ১০ বিলিয়ন ডলারের সামান্য বেশি অর্থের প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পেরেছে। কপ-২১ নামে পরিচিত প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনের প্রাক্কালে এই তহবিলকে আরও পরিচিত করে এর আকার বৃদ্ধির আশা করা হয়েছিল। তবে তহবিলের স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সঠিক পদ্ধতির অভাবে এটি নাগরিক সংগঠনগুলোর চাপে পড়ে যায়। ২০১৬ সালের নভেম্বরে, কপ-২১ এর ঠিক আগে জাম্বিয়ায় এক সভায় জিসিএফ বোর্ড দ্রুত আটটি জলবায়ু প্রকল্প অনুমোদন করে। অথচ তখনো এই তহবিলের একটি জোরদার তথ্য প্রকাশ নীতি বা জবাবদিহির ব্যবস্থা চালু হয়নি।

২০১৬ সালের মাঝামাঝি পরিস্থিতি খানিকটা বদলায়। তথ্য প্রকাশের কাজ করার জন্যে জিসিএফ আরও লোক নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেয়। বোর্ডের সভা অনলাইনে সরাসরি সম্প্রচারের জন্য যে ব্যাপক চাপ ছিল তাও মেনে নেয়। কষ্টসাধ্য হলেও এটা নিঃসন্দেহে একটা বিজয়, কারণ সেই ২০১২ সাল থেকে শতাধিক নাগরিক সংগঠন জিসিএফ বোর্ড সভা সরাসরি সম্প্রচারের দাবি জানিয়ে আসছিল।

১৪ http://www.survivalinternational.org/news/11276

১৫ https://www.theguardian.com/environment/2015/jul/09/green-climate-fund-partners-with-deutsche-bank-to-green-fury

জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান

সারা বিশ্বে জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনায় অগণিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান জড়িত এবং এ সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ব্যক্তি খাত থেকে শুরু করে নাগরিক সংগঠন এবং সেখান থেকে সরকার–সবখানেই এ ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যুক্ত রয়েছে। এতে প্রকৌশল প্রতিষ্ঠানের নীরিক্ষা বিভাগের কর্মী থেকে শুরু করে শত শত কোটি ডলারের জলবায়ু তহবিলের পরিচালনা পর্ষদের ব্যক্তিরা নিয়োজিত আছেন। জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থার সততা নিশ্চিত করতে এমন প্রতিটি ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো, প্রতিটি পর্যায়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে দায়বদ্ধ রাখতে নজরদারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের ভূমিকা রাখতে হবে।

জলবায়ু অর্থায়নের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের তালিকা দেওয়া এবং সেগুলো ধরে আলোচনা করাটা দীর্ঘ এবং অপ্রয়োজনীয় মনে হবে। তাই এই অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাপনার কাঠামো, প্রধান তহবিলগুলো এবং এ কাজে যুক্ত মূল ধারার নাগরিক সংগঠন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে আমরা একেবারে শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করতে পারি।

ইউএনএফসিসিসি এবং কনফারেন্স অব পার্টিজ (কপ)

জাতিসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত কাঠামো চুক্তি (ইউএনএফসিসিসি) এবং কপের তৈরি নীতিমালা এবং লক্ষের ওপর ভিত্তি করেই জলবায়ু সংক্রান্ত অর্থায়নের বড় পরিকল্পনাগুলোর উৎপত্তি। ইউএনএফসিসিসি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। এটি ১৯৯২ সালে গৃহীত হয়। এতে বলা হয়েছিল, মানবসৃষ্ট নানা কারণে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে এবং গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ বাড়ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে এবং কার্বন দূষণ প্রশমনে উন্নত দেশগুলোকে অবশ্যই আর্থিক দায়দায়িত্ব নিতে হবে।

কনফারেন্স অব পার্টিজ (কপ)

জাতিসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত কাঠামো চুক্তির (ইউএনএফসিসিসি) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কাঠামো হচ্ছে কপ। ইউএনএফসিসিসিতে স্বাক্ষরকারী ১৯৭টি দেশই কপ পার্টির অন্তর্ভুক্ত। কপের কর্মকাণ্ড মূল্যায়ন করতে প্রতি বছরই এর বৈঠক হয়। গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ হ্রাস করতে ইউএনএফসিসিসির যে লক্ষ্যমাত্রা আছে তা বাস্তবায়নে নতুন নতুন নীতি গ্রহণ করা হয়। লক্ষ্যটি ছিল 'জলবায়ু ব্যবস্থাকে ভয়াবহ মানবসৃষ্ট হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করতে ক্ষতিকর গ্যাসের নিঃসরণ একটি সহনীয় পর্যায়ে রাখা। www.unfccc.int

ইউএনএফসিসিসি চুক্তির একটি শক্ত আইনি ভিত্তি আছে। কারণ এখনো জাতিসংঘের সদস্য নয়, এমন কয়েকটি রাষ্ট্রসহ বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্র এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এই স্বাক্ষরকৃত দেশ মিলেই কপ পরিচালিত হয়। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ

বছরে একবার জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য সবচেয়ে ভালো পন্থা নির্ধারণসহ নীতি তৈরি করতে বসে।

তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী দেশগুলো বছরে যখন একবার একত্রিত হয়ে আলোচনায় বসে তখন সমস্যাও দেখা দেয়। কারণ, অধিকাংশ দেশ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ভূমিকা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করলেও কিছুদেশ সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিমতও পোষণ করে। আর এর ফলে কপ সাধারণত কোনো দেশকে সুনির্দিষ্ট কোনো কঠোর বাধ্যবাধকতা দিতে পারে না বরং কিছু ভাসা ভাসা দিক-নির্দেশনা দেয়। এরপরও ইউএনএফসিসিসি ১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রটোকল[১৬] এবং ২০১৫ সালে প্যারিস চুক্তি[১৭] করতে সক্ষম হয়েছে এবং কার্বন নিঃসরণ কমানোর বাধ্যতামূলক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই চুক্তিগুলো সরকারি ও বেসরকারি খাত থেকে কয়েকশ কোটি ডলার সংগ্রহসহ বিশ্ববাসীকে এক অভিন্ন সমস্যা মোকাবেলায় আরও মনোযোগী হতে ভূমিকা রেখেছে।

ইন্টারগভর্মেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)

আইপিসিসি হলো জাতিসংঘের অধীনে বিজ্ঞানীদের একটি সংস্থা যা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৮ সালে। বিশ্বের প্রধান সারির জলবায়ু বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এ সংস্থা গবেষণালব্ধ তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করে এবং নীতি নির্ধারকদের কাছে নিজেদের পর্যবেক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ চিত্র এবং কার্যকর অভিযোজন ও প্রশমনের উপায় তুলে ধরে। www.ipcc.ch

জলবায়ু তহবিল

জলবায়ু তহবিলগুলো মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা পালন করার মাধ্যমে দাতা সংস্থা ও ঋণদাতাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে দেয়। ক্ষতিকর গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ প্রশমন, জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া কিংবা বড় প্রকল্প পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে উন্নয়নশীল বা ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে এ অর্থ দেওয়া হয়। ১৯৯১ সালে গঠিত গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি (জিইএফ) ছিল ইউএনএফসিসিসির অধীনে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্রথম তহবিল। এরপর থেকে জলবায়ু অর্থায়নের নিমিত্তে ইউএনএফসিসিসির মাধ্যমে ও এর বাইরে একাধিক বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক তহবিল গঠিত হয়েছে। জলবায়ু তহবিল গঠনে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। এ রকম একটি তহবিল হচ্ছে ফরেস্ট কার্বন পার্টনারশিপ ফ্যাসিলিটি (এফসিপিএফ)। ইউএনএফসিসিসি স্বীকৃত এ তহবিল বিশ্বব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় চলে। জাতিসংঘের REDD+ উদ্যোগকে এগিয়ে নেওয়া এর লক্ষ্য। ২০১৫ কপ ২১ সম্মেলনের প্রাক্কালে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডকে দেখা হচ্ছিল একুশ শতকে জলবায়ু অর্থায়নের প্রধান মাধ্যম হিসেবে। ২০২০ সাল নাগাদ এই তহবিলের মাধ্যমে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার

১৬ http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php
১৭ https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf

সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং প্যারিস চুক্তির ঠিক আগে এই তহবিল কার্যকর হয়েছে। ২০২১ সালে যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো জলবায়ু সম্মেলনে উন্নয়নশীল এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলো প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলার ২০২০ সাল থেকে না দিয়ে ২০২৩ সালে থেকে প্রদান করবে বলে জানায়।

কয়েকটি প্রধান জলবায়ু তহবিল

গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)

ইউএনএফসিসির আওতায় গঠিত অন্যতম প্রধান একটি জলবায়ু তহবিল হলো জিসিএফ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে উন্নয়নশীল দেশে অভিযোজন, টেকসই উন্নয়ন এবং কার্বন নিঃসরণের হার কমানোর লক্ষ্য নিয়ে জিসিএফ গঠন করা হয়। প্রতিষ্ঠার সময় এর লক্ষ্য ছিল ২০২০ সাল নাগাদ বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন ডলার তহবিল জোগাড় করা। সেই লক্ষ্য পূরণ না হলেও জিসিএফ এখনো সবচেয়ে বড় জলবায়ু তহবিল। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের সরকারি উৎস থেকে এই তহবিলে ১০ দশমিক ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যোগ হয়েছে। www.greenclimate.fund

গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ)

১৯৯১ সালে জিইএফ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউএনএফসিসিসির বেশিরভাগ সদস্য রাষ্ট্র এই তহবিল ব্যবস্থাপনার সাথে যুক্ত রয়েছে। জলবায়ু অর্থায়নসহ পরিবেশগত বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করার লক্ষেই জিইএফ গঠিত হয়। জিইএফ এর সচিবলায় যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত এবং ৩২ সদস্যের জিইএফ কাউন্সিলের কাছে তহবিলের প্রতিবেদন দাখিল করতে হয়। জিইএফ কাউন্সিলে উন্নত এবং উন্নয়নশীলসহ সব দেশেরই প্রতিনিধিত্ব আছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে জিইএফ এ পর্যন্ত ১৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলার তহবিলের যোগান দিয়েছে। এর সঙ্গে আবার প্রায় চার হাজার প্রকল্পে ৭৫ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার পরিপূরক বেসরকারি অর্থায়নও আছে। www.thegef.org

অভিযোজন তহবিল বা দ্য অ্যাডাপটেশন ফান্ড

কিয়োটো প্রটোকলের অধীনে ২০০১ সালে অভিযোজন তহবিল গঠিত হয়। ২০০৭ সাল থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে অভিযোজন খাতে সহযোগিতা করার জন্য তহবিলটি কাজ শুরু করে। জিসিএফ এবং জিইএফ তহবিলের তুলনায় অভিযোজন তহবিলে অনেক কম অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এ তহবিল ২০১০ সাল থেকে ৬১টি দেশে মাত্র ৩ শত ৫৪ দশমিক ৯ মিলিয়ন ডলার বিতরণ করেছে। www.adaptation-fund.org

স্পেশাল ক্লাইমেট চেঞ্জ ফান্ড (এসসিসিএফ)

গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ) স্পেশাল ক্লাইমেট চেঞ্জ ফান্ড (এসসিসিএফ) এর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করে। বিশ্বের যে-সব উন্নয়নশীল দেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে

তাদের অভিযোজন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে সহায়তা করাই এই তহবিলের লক্ষ্য। এসসিসিএফ প্রকল্পগুলোকে উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচির পরিপূরক হিসাবে তৈরি করা হয়েছে। জলবায়ু তহবিলের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, উন্নত দেশগুলো এ তহবিলে এখন পর্যন্ত ৩ শত ৪৬ দশমিক ৩ মিলিয়ন ডলার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ তহবিলে এখন পর্যন্ত জার্মানি সবচেয়ে বেশি অর্থ সরবরাহ করেছে। www.thegef.org/gef/SCCF

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তহবিল বা লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ ফান্ড (এলডিসিএফ)

স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তহবিল বা লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ ফান্ড (এলডিসিএফ) হচ্ছে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটির ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত দ্বিতীয় জলবায়ু তহবিল। এ তহবিলের লক্ষ্য জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকির মুখে থাকা ৪৮টি দরিদ্র দেশের অভিযোজন বিষয়ক সকল চাহিদা মেটানো। এক্ষেত্রে প্রতিটি দেশ ন্যাশনাল অ্যাডাপটেশন প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন (নাপা) নামে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে এবং অভিযোজন খাতে নিজেদের জরুরি প্রয়োজন এবং আদর্শ প্রকল্পগুলো তুলে ধরবে এবং এ বিষয়ে জাতিসংঘের কাছে একটি প্রতিবেদন জমা দেবে। নাপা বাস্তবায়নের জন্য এ তহবিলের ৯ শত ৬২ মিলিয়ন ডলার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যয়িত হবে। www.thegef.org/gef/ldcf

ফরেস্ট কার্বন পার্টনারশিপ ফ্যাসিলিটি (এফসিপিএফ)

ফরেস্ট কার্বন পার্টনারশিপ ফ্যাসিলিটি নামের তহবিলটি বিশ্বব্যাংকের অধীনে গঠিত হয়। REDD+ প্রোগ্রামের আওতায় বনভূমি উন্নয়নভিত্তিক প্রশমন কাজে সহযোগিতা করা এই তহবিলের প্রধান উদ্দেশ্য। REDD+ এর পুরো অর্থ হলো Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation বা REDD প্লাস। বনে যে পরিমাণ কার্বন মজুদ করে বা মজুদে সহায়তা করে তার পরিমাণ নিরূপণ, বনের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং উন্নয়নশীল দেশে বনের কার্বন মজুদের পরিমাণ বৃদ্ধিই এই তহবিলের উদ্দেশ্য। ফরেস্ট কার্বন পার্টনারশিপ ফ্যাসিলিটি তহবিলের আওতায় এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে এবং এই তহবিলের আওতায় আরও দুটি ভিন্ন তহবিল আছে। তহবিল দুটি হলো কার্বন ফান্ড ও রেডিনেস ফান্ড। www.forestcarbonpartnership.org

ন্যাশনাল ডেজিগনেটেড অথরিটি (এনডিএ) বনাম ন্যাশনাল ইপ্লিমেন্টিং এনটিটি (এনআইই)

জলবায়ু অর্থায়নের কাঠামোর মধ্যে ন্যাশনাল ডেজিগনেটেড অথরিটি (এনডিএ) বা জাতীয় মনোনীত কর্তৃপক্ষ এবং ন্যাশনাল ইপ্লিমেন্টিং এনটিটি (এনআইই) বা জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা মূলত আমলাতান্ত্রিক ভূমিকা পালন করে। প্রতিষ্ঠান দুটির ভূমিকা এবং দায়িত্ব সম্পর্কে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের সাংবাদিকরা দারুণ

সব প্রতিবেদন তৈরিতে ভূমিকা রাখতে পারেন। কারণ শত শত কোটি ডলারের জলবায়ু অর্থায়নের বরাদ্দ তাদের মাধ্যমেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সুবিধাভোগীর হাতে পৌঁছায়।

এনডিএ হলো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান যা সাধারণত কোনো মন্ত্রণালয় হয়ে থাকে। অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করতে পারে এমন প্রতিষ্ঠানকে এনডিএ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। সরকারের মনোনীত এনডিএ–র কাজ হলো কোনো নির্দিষ্ট তহবিলের পক্ষে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা এবং তার দেশের চাহিদা নিরূপণ করে একটি তহবিল থেকে প্রকল্পের স্বীকৃতি পেতে ন্যাশনাল ইপ্লিমেন্টিং এনটিটি (এনআইই) –এর সঙ্গে একত্রে কাজ করা। তবে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন তহবিল থেকে প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের আগে এনডিএর অন্যতম একটি কাজ হলো প্রকল্প পেতে আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে প্রকল্প বাস্তবায়নে সক্ষম এই মর্মে অনাপত্তি সনদ প্রদান করা এবং তাকে জাতীয় বস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া। এছাড়াও এনডিএ উচ্চ পর্যায়ের কর্তৃপক্ষ হিসাবে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জলবায়ু অর্থায়নের বিষয় নিয়ে আপত্তি তুলতে পারে। বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অওতায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআডি) ন্যাশনাল ডেজিগনেটেড অথরিটি হিসাবে কাজ করে। বিস্তারিত দেখুন এখানে (http://nda.erd.gov.bd/en)।

অন্যদিকে এনআইইয়ের কাজ হলো প্রকল্প প্রস্তাব এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন করা। বিভিন্ন তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহ এবং প্রকল্পের কাজে তা ব্যয় করা এনআইইয়ের কাজ। তহবিলের নিরীক্ষা, মানবাধিকার এবং পরিবেশগত সুরক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখার জন্যে বড় অঙ্কের অর্থের ব্যবস্থাপনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এনআইইকে। আর এই কারণেই বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং উন্নয়ন ব্যাংকগুলো এনআইই হিসাবে মনোনীত হয়ে থাকে। তবে এনআইই সরকারিভাবে বড় কাজের জন্য মনোনীত হলেও তারা পুরোপুরি জবাবদিহিতার আওতায় নেই এবং তাদের সব কাজ স্বচ্ছ নয়। যেমন এনডিএতে কে বা কারা থাকবে তা ঠিক করার কর্তৃত্ব সাধারণত এককভাবে সরকারের। এক্ষেত্রে সরকার নির্বাচিত এসব ব্যক্তির স্বার্থের দ্বন্দ্ব (কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট) ঘটছে কি-না সে বিষয়ে জানানোর কোনো আইন বা নীতি থাকতেও পারে আবার না-ও থাকতে পারে। অন্যদিকে এনআইইর কার্যক্রম অনেক জটিল এবং সেখানেও অনিয়ম হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষ করে কোনো প্রকল্পের সাব কন্ট্রাক্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা না-ও থাকতে পারে। ধরা যাক, কোনো অনিয়মই হলো না, তারপরও সাংবাদিকেরা জনকল্যাণের কথা বিবেচনা করে এনআইই–এর অন্যান্য কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন। যেমন, যে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে তা কি সে দেশের সবচেয়ে জরুরি সমস্যার সমাধানের জন্য নেওয়া হয়েছে? ঠিকাদার অথবা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ব্যয়িত অর্থের প্রকৃত মূল্য নিশ্চিত করছেন কি? প্রকল্পের ফলে কারও মানবাধিকার বা ভূমির অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে কি? বাংলাদেশের এনআইই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এখানে দেখুন (http://nda.erd.gov.bd/en/c/page/national-implementing-entity-nie)।

সাংবাদিকেরা কোনো দেশের এনডিএ এবং এনআইইতে কারা আছেন তা খুঁজে দেখতে পারেন। বেশিরভাগ তহবিল তার ওয়েবসাইটে এনডিএ এবং এনআইই-দের নাম ও ঠিকানা এমনকি ব্যক্তিগত ইমেইল ঠিকানা রাখে। প্রধান তহবিলগুলোর একটি বিশদ তালিকা এবং এগুলোর বর্তমান সার্বিক অবস্থা জানার জন্য একটি ভালো ওয়েবসাইট হলো Climate Funds Update। http://www.climatefundsupdate.org/

গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নজরদারি সংগঠন এবং এনজিও

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রথমে লাখ লাখ এবং পরে শত শত কোটি ডলার আসা শুরু হয়। এ প্রেক্ষাপটে নাগরিক সমাজের সংগঠনগুলো এই অর্থ যাতে যথাযথ, কার্যকর ও স্বচ্ছভাবে ব্যয় হয়, তা নিশ্চিত করার প্রয়োজন অনুভব করে। আর এই লক্ষে কাজ করার জন্য মুনাফাভিত্তিক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের বাইরে কিছু অলাভজনক প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছে। এমন কয়েকটি সংগঠন হলো:

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই)

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বিশ্বের দুর্নীতিবিরোধী প্রধান জোট। এর সদরদপ্তর বার্লিনে অবস্থিত এবং বিশ্বের শতাধিক দেশে এর শাখা রয়েছে। টিআই দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্তর্জাতিক ঐক্য গড়ে তুলতে চায় এবং দুর্নীতি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রকাশ করে থাকে। এছাড়া টিআই প্রতি বছর বৈশ্বিক দুর্নীতির ধারণা সূচক প্রকাশ করে। জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন চুক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া উন্মুক্ত করতে অ্যাডভোকেসি, অর্থের প্রবাহ পর্যবেক্ষণ এবং এখাতে অনিয়মের চিত্র তুলে ধরার ক্ষেত্রে শীর্ষ ভূমিকা রাখছে টিআই। www.transparency.org

ওভারসিজ ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (ওডিআই)

যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওডিআই উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা ও অ্যাডভোকেসির কাজ করে। এ প্রতিষ্ঠানটি জলবায়ু অর্থায়নসহ মানবাধিকারের বিষয়গুলো সমুন্নত রেখে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নিয়েও কাজ করে থাকে। www.odi.org

দ্য ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট (ডব্লিউআরআই)

দ্য ওয়ার্ল্ড রিসোর্স ইনস্টিটিউট (ডব্লিউআরআই) একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের ৫০টি দেশে কাজ করে। এর মধ্যে ব্রাজিল, চীন, ইউরোপ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে এ প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় আছে। ডব্লিউআরআই-তে ওপেন ক্লাইমেট নেটওয়ার্ক নামে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও নাগরিক সমাজের সংগঠনের একটি জোট রয়েছে। এ জোট জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কোনো দেশের অগ্রগতির অত্যন্ত সুক্ষ্ম, যুক্তিসঙ্গত এবং স্বচ্ছ মূল্যায়ন করে থাকে। www.wri.org

ক্লাইমেট ফান্ডস আপডেট

ক্লাইমেট ফান্ডস আপডেট সম্ভবত জলবায়ুবিষয়ক তহবিলের প্রবাহের ওপর নজর রাখার সবচেয়ে সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার। এর মধ্যে আছে দাতাদের সহায়তা, তহবিল কাঠামো, জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে বিশেষায়িত প্রতিবেদন ও মন্তব্য প্রতিবেদন। ওয়েবসাইটটি হাইনরিক বোয়েল ফাউন্ডেশন এবং ওভারসীজ ডেভলেপমেন্ট ইন্সটিটিউটের একটি যৌথ উদ্যোগে গঠিত এবং পরিচালিত হচ্ছে। www.climatefundsupdate.org

জার্মানওয়াচ

জার্মানওয়াচ একটি অ্যাডভোকেসি সংগঠন যারা সামাজিকভাবে ন্যায্য, সমতাপূর্ণ, পরিবেশগতভাবে সঠিক এবং অর্থনৈতিকভাবে স্থিতিশীল উন্নয়নের চেষ্টা করে এবং সংশ্লিষ্ট আইনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তাদের জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলের উপর নজরদারি, গবেষণা ও মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করা। কনফারেন্স অব পার্টিজ (কপ) এবং প্রধান জলবায়ু তহবিলগুলো এই প্রতিষ্ঠানের কাজের মূল কেন্দ্রবিন্দু। http://germanwatch.org/en

অ্যাডাপটেশনওয়াচ

এনজিও, গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন সংগঠনের একটি বৈশ্বিক কনসোর্টিয়াম হলো অ্যাডাপটেশনওয়াচ। এর লক্ষ্য জলবায়ু অর্থায়নের অভিযোজন কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্থানীয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে উৎসাহ যোগানো। এ প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় আন্তর্জাতিক তহবিলে নজরদারির আরও ভালো কিন্তু সহজ কৌশলের উদ্ভাবন এবং তার ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এর মধ্যে থাকবে ম্যাপ, প্রতিবেদন এবং প্রকল্প এলাকা থেকে স্থানীয় সাধারণ লোকের সংগ্রহ করা তথ্য। www.adaptationwatch.org

যোগাযোগ ও গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য কর্মশালা আয়োজনের কৌশল বা ‘স্টার্টার প্যাক’

যোগাযোগ ও গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য

কর্মশালা আয়োজনের কৌশল বা "স্টার্টার প্যাক"

কেন সাংবাদিকদের জন্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়?

বেশিরভাগ নাগরিক সংগঠনগুলোর দুটি সমস্যা রয়েছে। তা হল সীমিত সম্পদ এবং জনগণের মধ্যে যথেষ্ট সচেতনতা তৈরিতে সহায়তা করার সুযোগের অভাব। মিডিয়া এ উভয় সমস্যার সমাধানে সহায়তা করতে পারে। তবে সাংবাদিকদেরকে জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়টিতে আগ্রহী করা বেশ কঠিন কাজ। তহবিল নিয়ে অনিয়মের খবরগুলো সবাইকে ক্ষুব্ধ করার মতো হলেও তা অনুসন্ধানের কাজটিও কষ্টকর। কারণ এ সংক্রান্ত ধারণাগুলো জটিল, আর খুঁটিনাটি জানতে গেলে তা কখনো কখনো একঘেঁয়েও লাগতে পারে।

নাগরিক সংগঠনগুলো সব বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে কর্মশালার আয়োজন করতে পারে। কর্মশালার মাধ্যমে গণমাধ্যমকে স্থানীয় পরিস্থিতির আলোকে জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়টি ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে প্রতিবেদন প্রস্তুতের ধারণা দেওয়া সহজ হয়ে থাকে। এছাড়া গণমাধ্যম জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও নাগরিক সংগঠনগুলোর প্রচারেও সহায়তা করতে পারে।

অন্যদিকে সাংবাদিকদের একটিই লক্ষ্য থাকে, তা হল একটি ভালো প্রতিবেদন। তবে নাগরিক সংগঠন গুলোকে মনে রাখতে হবে যে, সাংবাদিকরা যদি সেখানে নতুন কোনো তথ্য না পায় তাহলে ওই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। ট্র্যান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সচিবালয় এবং টিআইবিতে আমরা সাংবাদিকদের জন্য অনেক কর্মশালার আয়োজন করেছি। সেখান থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাগুলোর ভিত্তিতেই এই সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা তৈরি করা হয়েছে। আপনার নিজের সুবিধামতো পরিকল্পনার জন্য শেষের চেকলিস্টটি ব্যবহার করুন।

সাংবাদিক কর্মশালার আলোচ্য বিষয় ?

সাংবাদিকদের জন্য কর্মশালাটি যদি একদিনের হয় তাহলে নিচের নির্দেশিকাটি বিবেচনা করতে পারেন:

১. চা-নাশতা এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রধানের সূচনা বক্তব্য

২. জলবায়ু পরিবর্তন ও এ বিষয়ে বৈশ্বিক কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে একটি সাধারণ ধারণা তুলে ধরা

৩. আপনার দেশে জলবায়ু অর্থায়নের কাঠামো এবং এনআইই ও এনডিএ বিষয়ে একটি সাধারণ ধারণা প্রদান। জাতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়ন বা বাস্তবায়নাধীন কী কী প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে?

৪. মধ্যাহ্নভোজের বিরতি

৫ কেস স্টাডি: আপনার নিজের দেশ বা বিশ্বের অন্য কোনো স্থানে জলবায়ু অর্থায়নের নমুনা কাহিনী

৬ আলোচনা: ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সাংবাদিকদের সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব দিন

৭ সংবাদ সম্মেলন: আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে একটি নতুন প্রতিবেদন তৈরি করুন।

সাংবাদিক কর্মশালায় সাংবাদিকরা কী জানতে চান?

আপনার এলাকার সাংবাদিকরা কী কী বিষয় বুঝতে চান বা কী ধরনের প্রতিবেদন তারা করতে চান তা বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করা। আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, কর্মশালায় আসতে নাম দিয়েছেন এমন সাংবাদিকদের কাছে একটি সংক্ষিপ্ত কর্মশালা-পূর্ব জরিপের প্রশ্নপত্র পাঠানো। প্রশ্নপত্রে নিম্নের উল্লেখিত প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- জলবায়ু অর্থায়নের কোন বিষয়টি আপনার কাছে সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর;
- কী ধরনের প্রতিবেদন তৈরি করতে চান;
- আপনি কোন বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরতে আগ্রহী (ব্যবসা, রাজনীতি বা মানবাধিকার ইত্যাদি)।

ওপরের প্রশ্নের জবাবগুলো সাজিয়ে আপনাকে কর্মশালায় নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে এবং তা সহজ করে বুঝানোর জন্য কোন বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে, তা জানানোর ব্যবস্থা করতে হবে। সাধারণভাবে বলা যায়, সাংবাদিকরা এমন সোজাসাপ্টা তথ্য চান যা তাদের পাঠকের আগ্রহ মেটানোর মতো প্রতিবেদন তৈরিতে সাহায্য করবে। আপনার কাছে যা আগ্রহের তা সাংবাদিকদের আকৃষ্ট না-ও করতে পারে। যেমন– আপনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যদি গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড বিষয়ক হয় তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে জটিল বিষয়গুলো এবং এনআইই স্বীকৃতির জন্য আমানত বা জিম্মাদারী রক্ষার মানদণ্ড বিষয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এড়ানো। তার চেয়ে বরং তহবিলের অভাবের কারণে কাজ শুরু করা যাচ্ছে না কিন্তু খুবই ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে এমন প্রকল্পের উদাহরণ দিন।

শুধু কথা নয়, কিছু উদাহরণ দেখান

সাংবাদিকদের আগ্রহ ধরে রাখতে হলে একটি কথা মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, 'কিছু উদাহরণ দেখান, শুধু বলবেন না'। অন্যভাবে বলতে গেলে, জটিল কারিগরি বা নীতিগত সমস্যার বর্ণনার চেয়ে একটি গল্প বা কাহিনী অনেক বেশি শক্তিশালী, কারণ তা মনে রাখা সহজ।

উদাহরণস্বরূপ: জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে বলার সময় শুধু ইউএনএফসিসিসি প্রক্রিয়া বা কার্বন নিঃসরণ এর সংখ্যাগুলো উল্লেখ করবেন না। বরং নদী-তীরবর্তী কোনো গ্রামের একটি পরিবারের কথা বলুন যারা বন্যায় ঘরবাড়ি হারিয়েছে।

আবার দুর্নীতির বিষয়টি আলোচনার সময় শুধু তহবিল ব্যবস্থাপনায় যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণে ঘাটতি থাকার কথা বলবেন না, বরং প্রতিশ্রুত অর্থ না পাওয়ার কারণে বন্যায় বিধ্বস্ত গ্রামটি যে আর নতুন করে গড়ে তোলা যায়নি সে কথাও বলুন।

বিষয়বস্তুর ওপর নতুন ধারণা বের করার একটি উপায় হচ্ছে জলবায়ু খাতে অর্থের প্রবাহের ওপর নজর রাখা। জলবায়ু অর্থায়ন কোথা থেকে আসে ও কেন আসে তা ব্যাখ্যা করুন। এই ব্যাখ্যার মধ্যে থাকবে ইউএনএফসিসিসি এবং উন্নত বনাম উন্নয়নশীল দেশের আলোচনা। জাতীয় জলবায়ু অর্থায়ন কাঠামোটিও ব্যাখ্যা করুন। একইসাথে কোন কোন মন্ত্রণালয় ও দপ্তর তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত এবং বেসরকারি খাতের কোন কোন পক্ষ যুক্ত, তা সাংবাদিকদের কাছে পরিষ্কার করুন। আর সবচেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, চলমান প্রকল্প গুলোর পর্যবেক্ষণ সাংবাদিকদের কাছে ব্যাখ্যা করা। যেমন– প্রকল্পগুলোর জন্য যথেষ্ট তহবিল বরাদ্দ হয়েছে কি? সে অর্থ কি কার্যকরভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে? আপনার সংগঠনের গবেষণা ও অনুসন্ধানে পাওয়া প্রধান তথ্যগুলো কী কী?

সাংবাদিকরা সুনির্দিষ্ট সহায়তাও চাইতে পারেন। যেমন জটিল তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে সহায়তা অথবা আন্তর্জাতিক উপবিধি বা স্থানীয় ভাষায় অনুবাদকৃত আর্থিক নথি ও উপাত্ত। আপনার উচিত হবে তাদের চাহিদাগুলো পূরণ করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করা অথবা অন্য যারা সহায়তা করতে পারে তাদের কাছে পাঠানো।

সাংবাদিক কর্মশালায় যা করণীয় এবং যা এড়ানো উচিত

কর্মশালায় আলোচনার বিষয়বস্তু স্পষ্ট করুন

সাংবাদিকরা কর্মশালা থেকে ঠিক কী জানতে পারবেন সে বিষয়টি স্পষ্ট করুন। মনে রাখবেন কর্মশালা আর সংবাদ সম্মেলন এক নয়। তবে কর্মশালাটি সাংবাদিকদের প্রতিবেদনে ব্যবহার করার উপযোগী তথ্য সরবরাহ করার একটি ভালো উপায় হতে পারে। কর্মশালায় কী শেখানো হবে সাংবাদিকরা যেন আগে থেকে পরিষ্কার ধারণা পায় সেটা নিশ্চিত করুন।

আনুষ্ঠানিক বক্তব্য এবং অনানুষ্ঠানিক বক্তব্য পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করুন

কোনটা প্রতিবেদনে ব্যবহারের জন্য বা আনুষ্ঠানিক বক্তব্য আর কোনটা অনানুষ্ঠানিক বক্তব্য তা পরিষ্কার করুন। আনুষ্ঠানিক বক্তব্য অর্থ হচ্ছে, আপনি যা বলবেন, সাংবাদিকরা তা উদ্ধৃত করে লিখতে পারবেন। আলাদাভাবে নিষেধ না করলে আপনি যা বলবেন, সাংবাদিকরা তাই লিখতে পারেন। কর্মশালার পরিকল্পনা করার সময় ভেবে দেখুন, এর কোনো অংশ অনানুষ্ঠানিক বক্তব্য হতে পারে কি-না। যেমন, এমন হতে পারে আপনি এনডিএ ও কোনো ব্যক্তির সম্পর্কে ব্যক্তিগত মত দিলেন, কিংবা নিজেদের কোনো তদন্ত সম্পর্কে আগাম ধারণা দিলেন, কিন্তু যা এখনো জনসমক্ষে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়নি। সাংবাদিকদেরকে কর্মশালায় আমন্ত্রণ জানানোর সময়ই আপনি একটা বাক্য যোগ করে দিতে পারেন: ‘কর্মশালায় উল্লেখ করা কিছু তথ্য অফ দ্য রেকর্ড হতে পারে। আয়োজকরা অনুরোধ করলে অফ দ্য রেকর্ড অংশ প্রকাশ করা থেকে আপনি বিরত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে’।

আলোচনায় পরিভাষা পরিহার করুন

কর্মশালায় বেশি কঠিন পরিভাষা ব্যবহার করবেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, কর্মশালায় অংশ নেওয়া সাংবাদিকরা জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন। তারা বহু বিষয়ে জ্ঞান রাখলেও খুব কম বিষয়েই বিশেষজ্ঞ। কাজেই এমন কঠিন ভাষা ব্যবহার করবেন না, যাতে তারা বিভ্রান্ত হন বা বিরক্ত হয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

সুনির্দিষ্ট তথ্য উপস্থাপন করুন

কর্মশালায় আপনি যত বেশি কেস স্টাডি ও বাস্তব উদাহরণ তুলে ধরবেন, তা সাংবাদিকদের কাছে ততই মূল্যবান হবে। এটা কোনো একাডেমিক আলোচনা নয়, আর তারাও বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা নন। তারা গল্প বলিয়ে। কাজেই তাদেরকে গল্পের উপাদানের যোগান দিন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য অর্থ দেবেন না

সাধারণভাবে বললে, কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য সাংবাদিকদেরকে অর্থ দেওয়া ভালো কাজ নয়। কারণ, এতে স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে। নাগরিক সংগঠন ও সাংবাদিকরা মাঝেমধ্যেই একত্রে কাজ করলেও সাংবাদিকদের লেখা এবং আপনাদের তথ্য দেওয়া যেন লেনদেনের মতো না মনে হয়। তবে আপনার দেশের পরিপ্রেক্ষিতে দৈনন্দিন খরচ হিসেবে একটা ভাতা দিতে পারেন। আপনি এ বিষয়ে প্রচলিত গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা সম্পর্কে জানতে নিজ দেশের এনজিও ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

রেফারেন্স গাইড ও যোগাযোগের তথ্য দিন

একটি সারণি তৈরির কথা ভেবে দেখতে পারেন। এতে আপনার দেশের মূল অংশীজনের নাম ও পরিচয় থাকবে। এটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও অর্থের প্রবাহ ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করবে। সম্ভব হলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম, ইমেইল ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিন।

সাংবাদিকদের প্রতিক্রিয়া জানতে চান ও ফোরাম গঠন করুন

কর্মশালা বিষয়ে কর্মশালার আগে, কর্মশালার সময় ও কর্মশালা শেষ হলে সাংবাদিকদের কাছে মতামত, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি জানতে চাওয়া উচিত। এতে করে তাদেরকে যেসব বিষয় জানাতে চান সেগুলো গুছিয়ে নেওয়া সহজ হবে। আলোচনা অব্যাহত রাখতে একটা কমিউনিটি ফোরামও গঠন করা যেতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে ফেসবুক গ্রুপ ভালো কাজে আসে।

জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে প্রতিবেদনের জন্য প্রণোদনা দিন

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো অবদান রাখা সাংবাদিকদেরকে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ প্রেক্ষিতে টিআইবি অন্যান্য খাতের মতই জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন বিষয়ে প্রতিবছর গণমাধ্যম কর্মীদের জন্য একটি পুরস্কার চালু করেছে।

কর্মশালার প্রস্তুতির জন্য যা মনে রাখবেন

▶	আপনার অঞ্চলের সব ধরনের প্রচার মাধ্যম প্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো
▶	সাংবাদিকরা না যেতে পারলে সবসময় জানাতে পারেন না এবং তারা সাধারনত প্রচুর ইমেইলও পান, যার উত্তর দেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না
▶	আমন্ত্রণপত্র পাঠানোর কয়েকদিন পর ফোন করে জানুন, তারা তা পেয়েছেন কি-না। আসবেন কি-না তা-ও জেনে নিন। কেন আসা উচিত, তা বোঝানোর জন্য তৈরি থাকুন। তারা কিন্তু ফোনে জিজ্ঞেস করতেই পারেন
▶	নাম তালিকাভুক্ত করা সাংবাদিকদের কাছ থেকে জেনে নিন তারা কোন বিষয়ে জানতে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী
▶	তালিকাভুক্ত সাংবাদিকদের কাছে অনুষ্ঠানের সূচি পাঠান, যাতে তারা কী কী হবে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পান
▶	আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন কাঠামো এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সংক্ষেপে তুলে ধরবেন
▶	আপনার দেশের জলবায়ু অর্থায়ন কাঠামো ব্যাখ্যা করবেন
▶	সুনির্দিষ্ট কেস স্টাডি ও প্রতিবেদনের আইডিয়া দেবেন
▶	আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার সুবিধার্থে একটি ফোরাম গঠন করুন
▶	ফলোআপ প্রশ্নের জবাব দেওয়া ও প্রতিক্রিয়া জানতে পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন এবং দুর্নীতি বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

২০১২ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কম্বোডিয়ার সাংবাদিক হ্যাং সেরেই উদম তার পত্রিকা "ভোরাকচুন খেমর" এ একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।[১৮] প্রতিবেদনে বলা হয়, একজন মিলিটারি পুলিশ কমান্ডারের ছেলে অবৈধ কাঠ ব্যবসায় জড়িত ছিল। কাঠ ব্যবসার জন্য অবৈধ গাছ কাটার কারণে গত দুই দশকে দেশটির বনভূমি ব্যাপকভাবে উজাড় হয়েছে। এই প্রতিবেদন প্রকাশের পাঁচদিন পরই নিজের গাড়ির বুটে সেই সাংবাদিকের লাশ পাওয়া যায়।

সাংবাদিকদের সবচেয়ে কঠিন ও বিপজ্জনক বিটের কথা ভাবলে আপনার মাথায় হয়তো সবার আগে যুদ্ধ নিয়ে প্রতিবেদনের কথা আসবে। তারপর হয়তো থাকবে অপরাধ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত প্রতিবেদন। কিন্তু সাংবাদিকদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা বলে, পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত দুর্নীতির বিষয়ে প্রতিবেদন লেখাও সমান কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস (আরএসএফ) ২০১৫ সালের এক প্রতিবেদনে লিখেছে,[১৯] 'পরিবেশ সাংবাদিকরা যে সহিংসতার মুখোমুখি হচ্ছে, তা আগে কখনোই এত ভয়াবহ মাত্রায় ছিল না।

একজন দেশি বা বিদেশি সাংবাদিক হিসেবে এ বিষয়ে কাজ করতে গেলে আরও সতর্ক থাকা দরকার। স্পর্শকাতর বিষয়ে লেখার সময় বাড়তি সতর্কতা নিতে হবে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য এ গাইডটি তৈরি হয়েছে বেশ কয়েকটি সংবাদ ও এনজিও বিষয়ক গবেষণা ও কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে) এর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। সিপিজের "সাংবাদিক নিরাপত্তা গাইড"[২০] মাঠপর্যায়ে কাজ করা প্রতিবেদকদের জন্য একটি অবশ্যপাঠ্য বিষয়।

অ্যাসাইনমেন্ট বা বিটে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা

কোনো প্রতিবেদন বা বিট নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে দেশি এবং বিদেশি সাংবাদিকদের পরিস্থিতিগত বিষয়ে ভিন্নতা থাকে। কম্বোডিয়ার সাংবাদিক উদমের মৃত্যু এটাই দেখিয়েছে যে, নিজের কর্মক্ষেত্রে বসবাসকারী সাংবাদিকদের ঝুঁকি সাধারণত বেশি থাকে।

বিদেশি সাংবাদিকদের একটি দেশের সংশ্লিষ্ট ইস্যু নিয়ে কাজ করতে হলে সেই দেশের মূল কলাকুশলী এবং তাদের স্বার্থের বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে ও ধারণা রাখতে হবে। আপনি স্থানীয় ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হলেও স্থানীয় একজন সহযোগী বা মধ্যস্থতাকারী অনেক কাজে আসতে পারে। একজন সহযোগীর বা মধ্যস্থতাকারীর কাছ থেকে আপনি এমন কিছু বিষয় জানতে পারবেন, যা

[১৮] http://dotearth.blogs.nytimes.com/2012/09/13/another-murder-on-the-resource-frontier-this-time-a-journalist-in-cambodia/
[১৯] https://rsf.org/sites/default/IMG/pdf/rapport_environnement_en.pdf
[২০] https://cpj.org/reports/2012/04/journalist-security-guide.php

অনলাইনে টুকরো টুকরো খবর পড়ে জানতে পারবেন না। বিশেষ করে যে দেশে ভীতি প্রদর্শন, সেলফ-সেন্সরশিপ ও সরকারি সেন্সরশিপ একটি সাধারণ বিষয়। আপনার কাজের পরিকল্পনা, প্রতিবেদনের জন্য যেখানে যাবেন সেই স্থানের নামসহ আনুসঙ্গিক তথ্য আপনার চাকরিদাতা, দেশে থাকা পরিবার এবং বিশ্বস্ত লোকদের জানিয়ে রাখুন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সাংবাদিকের পরিচয়পত্র সংক্রান্ত স্থানীয় আইনকানুন সম্পর্কে ভালো করে জেনে নিন।

বিদেশি সাংবাদিকদের জন্য অনেক ঝুঁকি থাকলেও সিপিজের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, প্রতিবেদন তৈরির কারণে কারাবন্দী বা হত্যার শিকার হওয়া স্থানীয় সাংবাদিকের সংখ্যা সে তুলনায় অনেক বেশি।[২১] তাদের ক্ষেত্রেও বিদেশীদের অনুসৃত নিরাপত্তা নির্দেশনাগুলোর অনেকগুলো প্রযোজ্য। একারণে স্থানীয় সংবাদপত্র সংগঠন বা পরিবেশসংক্রান্ত বেসরকারি সংগঠনের (এনজিও) সহায়তা নিন। তারা আইনগত, নিরাপত্তা বা রাজনৈতিক সহায়তা দিতে পারে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ঝুঁকির মাত্রা খুব বেশি বলে মনে করলে অ্যাসাইনমেন্ট প্রত্যাখ্যান করতে সংকোচ করবেন না। কারণ আপনার নিজের ও পরিবারের ওপর যে মানসিক চাপ তৈরি হবে, সে তুলনায় একটি প্রতিবেদন ততো গুরুত্বপূর্ণ না-ও হতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি অন্যভাবে করার উপায় খুঁজে বের করুন।

সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে জানা, সে সব ঝুঁকি কমানো এবং আপনার নিজের ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা বোঝার একটি উপায় হলো বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দালিলিক রেকর্ডের ভিত্তিতে নিরাপত্তা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা। ঝুঁকির বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে নিরাপত্তা মূল্যায়নের উপর সিপিজে একটি নির্দেশিকা তৈরি করেছে।[২২]

আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকলে করণীয়

আক্রান্ত হওয়ার ভয় একটি তীব্র উদ্বেগের বিষয়। এবিষয়ে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার (আরএসএফ) নামের প্রতিষ্ঠান স্পর্শকাতর প্রতিবেদন করা সাংবাদিকদের পাওয়া বহু হুমকির ঘটনা তালিকাভুক্ত করেছে। এর মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হত্যার হুমকি থেকে শুরু করে মারধর, এমন কী অগ্নিসংযোগের ঘটনাও আছে। সিপিজের মতে, সাংবাদিকদের ওপর সহিংসতার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সবচেয়ে বেশি দায়ী সরকারবিরোধী সংগঠনগুলো। তবে তাদের খুব কাছে থেকেই দ্বিতীয় অবস্থানে আছে সরকার বা সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সংগঠনগুলো।

বিশ্বব্যাপী সাংবাদিকতা সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর একটি তালিকা তৈরি করেছে সিপিজে।[২৩] নতুন কোনো প্রতিবেদন তৈরি করা বা অতি জরুরি বিষয়ের ক্ষেত্রে এসব সংগঠন প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারে। ওই তালিকায় আপনার দেশের সংগঠনের নাম আছে কি-না দেখুন।

---

২১ https://cpj.org/reports/2012/04/basic-preparedness.php%232
২২ https://cpj.org/security/assessment_form.pdf
২৩ https://cpj.org/reports/2012/04/journalism-organizations.php

অন্যান্য বাধা

জলবায়ু তহবিল সম্পর্কিত প্রতিবেদন করাটা কেবল মাঠ পর্যায়ের কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বোর্ড রুম ও সভা-সেমিনারের আলাপচারিতা আর প্রাপ্ত নথিপত্র ঘেঁটে যোগসূত্রগুলো মেলানোর মাধ্যমে মূলত এ সব প্রতিবেদন তৈরির বেশিরভাগ কাজ হয়ে থাকে।

উন্নত দেশগুলোও পরিবেশগত ইস্যুতে সংবাদমাধ্যমকে চুপ রাখার পদক্ষেপ নেয়, যা কানাডার একটি উদাহরণ থেকে বোঝা যায়। আরএসএফ বলেছে, আলকাতরাযুক্ত বালি থেকে তেল উৎপাদন নিয়ে প্রতিবেদন করা থেকে সাংবাদিকদের নিবৃত্ত করতে কানাডার স্টিফেন হারপার সরকার বিভিন্ন ধরনের সমন্বিত পদক্ষেপ নিয়েছে। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে, সরকারি বিজ্ঞানীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া প্রতিরোধ করা, ২০১০ সালে "টার স্যান্ডস" নামে প্রকাশিত গ্রন্থের লেখকের সম্মানহানির পদক্ষেপ নেওয়া।

আরএসএফের পর্যবেক্ষণ হলো, তথ্য প্রবাহের বাঁধা ভাঙার একটি পথ হচ্ছে সংখ্যাগত শক্তি কাজে লাগানো। একজন একক সাংবাদিকের পক্ষে সরকার বা বহুজাতিক সংস্থার বিরুদ্ধে হয়তো বিশেষ কিছু করা সম্ভব নাও হতে পারে, তবে জলবায়ু নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করার লক্ষে সাংবাদিকরা একজোট হয়ে কাজ করলে অনেক বেশি চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব। "সোসাইটি", "নেটওয়ার্ক", "অ্যাসোসিয়েশন" ইত্যাদি প্রত্যয়যুক্ত নামের সাংবাদিক সংগঠন বিশ্ব জুড়েই বাড়ছে। তার মধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খুবই সীমিত এমন দেশও আছে।

নিচে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কিছু জাতীয় পর্যায়ের পরিবেশ বিষয়ক সাংবাদিক সংগঠনের তালিকা দেওয়া হলো

বাংলাদেশ- Forum of Environmental Journalists of Bangladesh (FEJB)
https://www.facebook.com/pages/Forum-of-Environmental-Journalists-of-Bangladesh-FEJB/530554087012991

বেনিন- Association des Journalistes et Communicateurs Scientifiques du Benin
http://www.ajcsb.net/

বুরকিনা ফাসো- Association des Journalistes et Communicateurs scientifiques du Burkina Faso
http://www.wfsj.org/associations/page.php?id=264

চীন- China Forum of Environmental Journalists
http://www.cfej.net/

ইথিওপিয়া- Ethiopian Environment Journalists Association
https://www.facebook.com/Ethiopian-Environment-Journalists-Association-EEJA-1380834505472279/

ভারত- Forum of Environmental Journalists in India
http://feji.org.in/

ইন্দোনেশিয়া- Society of Indonesian Environmental Journalists
http://www.siej.net/

কেনিয়া- Media for Environment, Science, Health & Agriculture
http://meshakenya.org/

মেক্সিকো- Society of Environmental Journalists
http://www.sejarchive.org/international/espanol_REMPAconferencia2007.htm

পাকিস্তান- National Council of Environmental Journalists
http://ncejpak.org/

ফিলিপাইন- Philippine Network of Environmental Journalists
https://www.facebook.com/Philippine-Network-of-Environmental-Journalists-Inc-PNEJ-190967870939713/

নেপাল- Nepal Forum of Environmental Journalists
http://nefej.org.np/

শ্রীলঙ্কা- Sri Lanka Environmental Journalists Forum
http://www.environmentaljournalists.org/

সুইডেন- Environmental Journalists
http://www.miljojournalisterna.se/

তানজানিয়া- Journalists Environmental Association of Tanzania
http://www.jettanz.com/

থাইল্যান্ড- Thai Society of Environmental Journalists
https://www.facebook.com/thaisej.soc?ref=br_rs_WyJrZXI3b3Jkc19zZWFyY2giXQ%3D%3D

যুক্তরাষ্ট্র- Society of Environmental Journalists
http://www.sej.org/

ভিয়েতনাম- Vietnam Forum of Environmental Journalists
http://www.vfej.vn/en.html

জিম্বাবুয়ে- Zimbabwe Environmental Journalists Association
https://www.facebook.com/zejaworld/

আপনি কি এমন কোন সংগঠনের ব্যাপারে জানেন, যা এ তালিকায় যুক্ত হওয়া উচিত? তাহলে যোগাযোগ করুন:

ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা
সংক্রান্ত পরিভাষা ও শব্দকোষ

জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিভাষা ও শব্দকোষ

জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট শব্দকোষ

জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অন্য শব্দকোষগুলো এসব পরিভাষাকে (বা আমরা যে শব্দগুলো দিইনি সেগুলোকেও) হয়তো আরও বিশদভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারে। আমাদের এই শব্দকোষের লক্ষ্য হলো সংক্ষেপে ও সহজসরল কথায় পরিভাষাগুলোকে ব্যাখ্যা করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্নীতি ও স্বচ্ছতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ধারণাগুলোকে তুলে ধরা। এই অধ্যায়ের শেষে অন্য কয়েকটি শব্দকোষের লিংক দেওয়া হলো।

জবাবদিহিতা

একেবারে মৌলিক ধারণা থেকে বললে, জবাবদিহিতা হলো কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়, কর্মকাণ্ড, নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়ে হিসাব দেওয়ার বাধ্যবাধকতা। আইনি বিধিবিধান, ক্রমস্তর বিন্যাস, স্বাধীন নজরদারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠানের আর্থিক নিয়ম ও বিধিবিধান লঙ্ঘনের জন্য সাজা প্রদান ইত্যাদি বিষয় সাধারণত একটি স্বাধীন ও জবাবদিহিতামূলক শাসনব্যবস্থা নিশ্চিতের জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। আচরণগত বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা সম্ভব হলে সেই পদ্ধতি পুরোপুরিভাবে জবাবদিহিতার আওতায় থাকে। সার্বিকভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা নিজের কার্যকলাপের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে রিপোর্ট করতে দায়বদ্ধ থাকলে, তৃতীয় পক্ষের হাতে পর্যালোচনা ও অনুসন্ধানের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকলে, এই বিষয়ে যারা আওয়াজ তুলবেন তাদের বা হুইসেল ব্লোয়ারদের সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকলে এবং সর্বোপরি আইন লঙ্ঘনের জন্য ও অনিয়মের জন্য দণ্ডের ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকলে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব।

অভিযোজন

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বর্তমান ব্যবস্থা বা পদ্ধতির (যেমন, ব্যাবসায়িক বা আবাসিক এলাকাগুলো) সাথে পরিবর্তিত পরিস্থিতির খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টাকেই অভিযোজন বলে। অন্যভাবে বললে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব হ্রাসে পরিবর্তিত পরিস্থিতে বিভিন্নভাবে টিকে থাকার উপায় চিহ্নিত করে সেই অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াকে অভিযোজন বলে। ইন্টারগর্ভমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)–এর মতে তিন ধরনের অভিযোজন রয়েছে[২৪]: জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অনুমান করে রদবদল বা সমন্বয় ঘটানো; জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যেসব রদবদল বা সমন্বয় আপনাআপনি ঘটে তা মেনে নেওয়া এবং নীতিমালা সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিকল্পিত সিদ্ধান্তের কারণে যে রদবদল হয়, তার সমন্বয় ঘটানো। বিশ্বব্যাংকের হিসাবে, ২০১০ সাল থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের জন্য বছরে ৭০ বিলিয়ন থেকে ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের দরকার হবে।

---

[২৪] https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/annexessglossary-a-d.html

বাড়তি সহায়তা বা অ্যাডিশনালিটি

বিভিন্ন সময়ে অনেকগুলো আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় (২০০৯ সালের কোপেনহেগেন চুক্তিসহ) উন্নয়নশীল দেশগুলোকে "নতুন ও বাড়তি সম্পদ" দিতে উন্নত দেশগুলোকে আহ্বান জানানো হয়েছে। জলবায়ু আলোচনায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন ও অভিযোজনে সহায়তা করতে যে বর্ধিত আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাকেই "অ্যাডিশনালিটি" বা বাড়তি সহায়তা বলে। সাধারণভাবে বললে, বাড়তি সহায়তা হলো আনুষ্ঠানিক উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে জিডিপির ০ দশমিক ৭ শতাংশ প্রদানের যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, তার বাইরে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য বাড়তি কোনো সহায়তা।[২৫] কিন্তু আসলে ঠিক কোন তহবিলগুলোকে বাড়তি সহায়তা হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং উন্নত দেশগুলো সম্ভাব্য কী পরিমাণে সহায়তা দেবে, তা এখনও স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতেও এ ধারণাটি সুস্পষ্ট করা হয়নি। বরং "অ্যাডিশনালিটি" কথাটি বাতিল করে উন্নত দেশগুলোকেই ইউএনএফসিসিসির আওতায় বিদ্যমান বাধ্যবাধকতাগুলো পূরণে আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

নিরীক্ষণ

একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিত কাজের দাবির প্রেক্ষিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সনদপত্র দেওয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে নিরীক্ষণ। যে কোনো সম্পাদিত কাজের ওপরেই নিরীক্ষণ চালানো যেতে পারে। তবে সাধারণত এই প্রক্রিয়ায় আর্থিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হয়। একজন নিরীক্ষক একটি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বিবরণ ও প্রতিবেদনগুলো সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ আছে কি-না তা খতিয়ে দেখেন। বিভিন্ন বিষয়ে নিরীক্ষণ হতে পারে, যেমন পরিবেশ বিষয়ক নিরীক্ষকেরা একটি শিল্প কারখানার মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ বা দূষণের সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলোকে মূল্যায়ন করে থাকেন। আর একটি কার্বন নিংসরণ প্রকল্প নিরীক্ষণে একটি প্রতিষ্ঠানের গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ বা "কার্বন ফুটপ্রিন্ট" পরিমাপ করে দেখা হয়। সরকারগুলো কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা ঠিকমত অর্জিত হচ্ছে কি না, তা মূল্যায়ন করতে পারফরমেন্স নিরীক্ষণ পরিচালনা করতে পারে।

মহা-নিরীক্ষক

মহা-নিরীক্ষক বা কন্ট্রোলার হলেন একজন সরকারি কর্মকর্তা, যার হাতে সরকারি তহবিলের কার্যকর ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। নীতিমালার সঠিক প্রয়োগ এবং তহবিল ব্যবহারের বিষয়ে নিরপেক্ষ অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনতে আইনপ্রণেতারা মহা-নিরীক্ষকের দপ্তরের ওপরেই নির্ভরশীল।

কার্বন ক্রেডিট

কার্বন ক্রেডিট হলো এক টন কার্বন-ডাই-অক্সাইডের (অথবা অন্য কোনো গ্রিনহাউস গ্যাসের) সমপরিমাণ কার্বন নিঃসরণের অনুমতি, যা কার্বন অফসেটের বা সমতার ভিত্তিতে নিঃসরণ হয়। কার্বন ক্রেডিটধারীদের নিজেদের কোটার বাইরেও বাড়তি গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের অনুমতি দেওয়া হয়। কারণ, কার্বন ক্রেডিট এই মর্মে প্রত্যায়ন করে যে, এই কার্বন নিঃসরণের বিপরীতে বিশ্বের অন্য কোথাও কার্বন অফসেট বা কমানো হয়েছে। কার্বন ক্রেডিটকে বিক্রি বা বিনিয়োগও করা যেতে পারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার মাধ্যমে কার্বন ক্রেডিট অর্জন করতে পারে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বা বন সংরক্ষণের মাধ্যমে তা করা যেতে পারে।

[২৫] http://www.oecd.org/dac/stats/officialdevelopmentassistancedefinitionandcoverage.htm

ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম)

উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা পরিবহন ব্যবস্থায় টেকসই অবকাঠামো গড়ে তুলতে উৎসাহিত করার জন্য কিয়োটো প্রটোকলের আওতায় ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউএনএফসিসিসির আওতায় একটি নতুন প্রকল্পকে সিডিএম প্রকল্প হিসেবে প্রত্যায়ন গ্রহণের মাধ্যমে কার্বন বাজারে নথিভুক্ত হতে হয় এবং কার্বন ক্রেডিট অর্জন করতে হয়। এই নথিভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াটি একটি প্রকল্পকে "অ্যাডিশনাল" প্রকল্পের মর্যাদা দেয় এবং এই প্রকল্পের মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব হবে বলে অনুমান করা হয়। সহজ ভাষায় সিডিএম প্রকল্পগুলো নিজেদের "অ্যাডিশনালিটি"–এর ওপর ভিত্তি করে প্রত্যায়িত পরিমাণ কার্বন ক্রেডিট অর্জন করে। নথিভুক্ত এই এডিশনাল প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যায়িত কার্বন, কার্বন বাজারে "কার্বন ক্রেডিট" হিসেবে উন্নত দেশগুলোর কাছে বিক্রি করা যায়। সেই কার্বন ক্রয়ের মাধ্যমে উন্নত দেশগুলো তাদের কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে, এমন ধারণা থেকে কার্বন বাজার তৈরি হয়।

২০১৬ সালের জুন মাস পর্যন্ত ইউএনএফসিসিসির আওতায় সিডিএম পদ্ধতির ৭ হাজার ৭ শত টির বেশি প্রকল্প নিবন্ধিত হয়েছে। সম্প্রতি কার্বন বাজার পড়তির দিকে চলে গেছে। প্রকল্পের সংখ্যা অত্যাধিক হওয়া এবং উন্নত দেশগুলোর জন্য উচ্চভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ না করার কারণে এমন ঘটেছে। তবে অন্যান্য কারণেও সিডিএমকে একটি ব্যর্থ পদ্ধতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে রয়েছে "অ্যাডিশনালিটি" বা একটি প্রকল্প বাড়তি হওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জালিয়াতি করা বা ভুল প্রকল্পকে সিডিএম প্রকল্প হিসাবে প্রত্যায়ন করা। বিশ্বব্যাংকের স্বাধীন মূল্যায়ন গ্রুপ এই সমস্যার সারসংক্ষেপ করে বলেছে "অ্যাডিশনালিটি" বা বাড়তি হওয়ার যোগ্যতা যাচাই করার প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত জটিল, ব্যয়বহুল ও এক অর্থে অকার্যকর এবং সেই কারণে ত্রুটিপূর্ণও। এই সব বিবেচনায় পরিবেশবাদীরা বাড়তি প্রকল্প এবং কার্বন পরিমাপে অধিকতর কঠোর যাচাই বাছাই করার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বিনিয়োগকারীরা অধিকতর সুশৃঙ্খল পদ্ধতির পরিমাপের ওপরে জোর দিয়েছেন। বাড়তি কার্বনের পরিমাণ যাচাই করার বর্তমান পদ্ধতিটি সম্ভবত দুটি পদ্ধতির সবচেয়ে খারাপটির সমন্বয়। আর তা হলো, লেনদেন সম্পাদনে অত্যাধিক চার্জ কর্তন এবং সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নন অ্যাডিশনাল প্রকল্পকে অ্যাডিশনাল হিসাবে মূল্যায়ন করা। তবে ক্রমশই পর্যবেক্ষকরা একমত হচ্ছেন যে, প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন পর্যায়ে অ্যাডিশনালিটি নির্ধারণ অনেকাংশেই বাস্তবতা বিবর্জিত। '

জলবায়ু দায়

জলবায়ু পরিবর্তন ঘটানোর দায় হিসেবে উন্নত দেশগুলোকে উন্নয়নশীল বা ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে– জলবায়ু সংক্রান্ত ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে জলবায়ু দায় এমন একটি ধারণা থেকে উদ্ভব হয়েছে। কারণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অপ্রত্যাশিতভাবে প্রভাবিত করছে। জলবায়ু দায়ে দুই ধরনের উপাদান রয়েছে: অভিযোজন দায় ও নিঃসরণ দায়। অভিযোজন দায় হলো সেই অর্থ যা উন্নয়নশীল দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি এড়ানো, এড়ানোর

অযোগ্য ক্ষতি এবং উন্নয়নের সুযোগ হারানোর ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের পাওনা বলে মনে করে। আর নিঃসরণ দায় এই ধারণারভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যে, বায়ুমণ্ডল কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে গ্রিনহাউস গ্যাস ধারণ করতে পারে এবং উন্নত দেশগুলো তাদের চাহিদার চেয়ে বায়ুমন্ডলের অধিক পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস ছেড়েছে। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য এখন বাড়তি গ্রিনহাউজ গ্যাস নিঃসরণের প্রয়োজন থাকলেও জলবায়ু পরিবর্তন রোধের দায়িত্বের কারণে তা করতে পারছে না। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলো মনে করে, এর জন্য তাদের উন্নতদেশগুলো থেকে ক্ষতিপূরণ পাওয়া উচিৎ।

জলবায়ু অর্থায়ন

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রশমন ও অভিযোজন কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি বিরাট পরিমাণ অর্থের লেনদেনের সৃষ্টি হয়েছে। সার্বিকভাবে এই লেনদেনকৃত অর্থকে জলবায়ু অর্থায়ন বলা হয়ে থাকে। ২০১৬ সাল পর্যন্ত এই অর্থের বড় অংশই ব্যবহার করা হয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন খাতের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে– যেমন, নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বা গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে। বন্যা প্রতিরোধের মতো অভিযোজন কর্মকাণ্ডগুলোতে ততোটা তহবিল যায়নি। সংক্ষেপে বললে, জলবায়ু অর্থায়ন হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য উন্নত দেশগুলোর আর্থিক সহায়তা যা নিয়মিত উন্নয়ন সহায়তার বাইরে (যা যে কোনো উপায়ে দেওয়া হয়ে থাকে) "নতুন ও বাড়তি" অর্থ। কেউ কেউ জলবায়ু সংক্রান্ত ন্যায়বিচারের প্রেক্ষাপট থেকেও জলবায়ু অর্থায়নকে সংজ্ঞায়িত করে থাকেন। এ ধরনের সংজ্ঞায় বলা হয়, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় "মূল দায়ী" হিসেবে উন্নত দেশগুলো উন্নয়নশীল দেশগুলোকে যে ক্ষতিপূরণ দিয়ে থাকে তাকে জলবায়ু অর্থায়ন বলে।

জলবায়ু তহবিল

জলবায়ু তহবিল হলো কোনো নির্দিষ্ট তহবিলে জমাকৃত সেসব অর্থ যা জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই তহবিল হতে পারে বহুপাক্ষিক (বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থ), দ্বিপাক্ষিক (কোনো একটি সরকার ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে অর্থের লেনদেন) বা জাতীয় (অভ্যন্তরীণভাবে তহবিল গঠন ও ব্যয়)। প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ বিবেচনায় সবচেয়ে বড় তহবিলটি হচ্ছে সবুজ জলবায়ু তহবিল বা গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড।

জলবায়ু ন্যায়বিচার

জলবায়ু ন্যায়বিচার এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর সাথে সম্পৃক্ত নৈতিক বিষয়ের প্রতি সমর্থন এবং সাড়া দেওয়ার বিষয়গুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়ে থাকে। এই সাড়া দেওয়ার বিষয়গুলো অনেকক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক বা বাস্তবিক না হলেও সবগুলোই নৈতিক ইস্যুর বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার সক্ষমতা কম। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনে তাদের ক্ষতি বেশি হলেও দায় অনেক কম। তাই উন্নয়নশীল দেশগুলোর যুক্তি, গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণের মাধ্যমে এই ক্ষতি সংঘটনের দায়টা উন্নত দেশগুলেকেই নিতে হবে

এবং নৈতিক ইস্যুগুলোর বিবেচনায় নিয়ে অর্থ, উন্নয়ন সহযোগিতা ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে ক্ষতির খেসারত দরিদ্র ও ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠীর জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দিতে হবে।

দুর্নীতি

দুর্নীতি হলো কারও ওপর ন্যস্ত ক্ষমতা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করা। দুর্নীতি বিভিন্নভাবে সংঘটিত হতে পারে; যেমন ঘুষ গ্রহণ, আত্মসাৎ, চাঁদাবাজি বা জালিয়াতির মত অনৈতিক কাজের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি করা। দুর্নীতির তিন ধরনের– যথাক্রমে বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও রাজনৈতিক দুর্নীতি। বৃহৎ দুর্নীতি হলো সেসব কর্মকাণ্ড যা সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে ঘটানো হয়। এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন নীতি বা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় কর্মপদ্ধতিতে ব্যত্যয় ঘটানো হয়। এতে করে জনগণের কল্যাণকে বিসর্জন দেওয়ার মাধ্যমে প্রভাবশালীরা সুবিধা নিতে সক্ষম হন। আর নিম্ন ও মধ্যম পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তারা সাধারণ মানুষের সঙ্গে দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার সময় তাঁদের ওপর ন্যস্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করলে সেটা ক্ষুদ্র দুর্নীতি। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পুলিশ বিভাগ ও অন্যান্য সংস্থার কাছে মৌলিক সেবা গ্রহণ করতে গিয়ে দুর্নীতির শিকার হন। রাজনৈতিক দুর্নীতি হলো বিভিন্ন নীতি, প্রতিষ্ঠান এবং সম্পদ ও অর্থ বরাদ্দের প্রক্রিয়ার বিধি-বিধানসমূহে হস্তক্ষেপ করা। রাজনৈতিক নীতি নির্ধারকেরা নিজেদের ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্পদ বৃদ্ধি করতে পদমর্যাদার অপব্যবহার করে দুর্নীতি করে থাকেন।

জাতীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (এনডিএ)

এনডিএ হলো জাতীয় পর্যায়ের একটি সংস্থা যার হাতে টেকসই প্রকল্পের জন্য উপযুক্ততা মূল্যায়ন এবং জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর স্বীকৃতি প্রদানের দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে। ক্লিন ডেভেলপমেন্ট মেকানিজম (সিডিএম)–এর আওতায় এনডিএ সে সব প্রকল্পের বিষয়ে অনুমোদন (লেটার অব অ্যাপ্রুভাল) দিয়ে থাকে, যেগুলোকে টেকসই উন্নয়নসংক্রান্ত সব আইনগত শর্ত পূরণ করতে হয়। অন্যান্য প্রেক্ষাপটে (যেমন, সবুজ জলবায়ু তহবিল) এনডিএ–এর ক্ষমতা আরও বেশি। এর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য আবেদন করা এবং এই তহবিলগুলোর আওতায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে আপত্তি তোলা।

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির মানুষ

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠির মানুষ হলো এমন কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত জনগোষ্ঠী, যে বৈশিষ্ট্যগুলো তাদেরকে সাংস্কৃতিক এবং ভৌগোলিকভাবে অন্যকোনো জনগোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র করে তোলে। সাধারণত তাদের বিভিন্ন স্বতন্ত্র প্রথ াগত আচরণ ও কার্যকলাপ থাকে। যেমন সরকারের বাইরেও তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক কাঠামো থাকে এবং একটি ভৌগোলিক এলাকার সঙ্গে তাদের বিশেষ দৃঢ় সম্পর্ক থাকে। তাদের পূর্বপুরুষরা আধুনিক রাজনৈতিক রাষ্ট্র গঠনের আগে থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় বাস করে আসছে। একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক থাকার কারণে এই জনগোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তনে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণেই নাগরিক সংগঠনগুলো জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণে এবং গঠিত বিভিন্ন কমিটিতে, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠি গ্রুপগুলোর অন্তর্ভুক্তির দাবি তুলে আসছে। সংগঠনগুলো আরও বলে, যেসব

জলবায়ু প্রকল্প আদিবাসীদের প্রভাবিত করে, সেগুলোতে কোনো অনিয়ম হলে আদিবাসীরা যাতে অভিযোগ করতে পারে, সে জন্য তাদের ক্ষমতায়ন করতে হবে।

সততা

সততা হলো প্রকৃত পক্ষে বিধিবিধান ও নৈতিক মানদণ্ড মেনে চলা এবং সততা ও স্বচ্ছতার সঙ্গে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় জনগণের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব ও ক্ষমতা প্রাপ্ত লোকজন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নিজেদের অবস্থানকে ব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হয়ে থাকে, যা সততার ব্যত্যয়।

আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (আইএফআই)

আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ একাধিক দেশের দ্বারা গঠিত কোম্পানি। সেখানে সাধারণত সরকারগুলো শেয়ারহোল্ডার। এসব প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য ঋণ, অনুদান বা বিনিয়োগ আকারে আর্থিক সহযোগিতা করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বব্যাংকও একটি আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি জাতিসংঘের একটি অংশ যার মিশন হলো বৈশ্বিক দারিদ্র হ্রাস করা। জলবায়ু প্রশমন ও অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ উৎস। অর্থায়নের প্রস্তাব তৈরির পাশাপাশি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণের জন্য রাষ্ট্রগুলোকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে এসব তহবিল প্রায়শই আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর নির্ভরশীল থাকে। অবশ্য আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমালোচকেরা বলে থাকেন, এ ক্ষেত্রে বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো পশ্চিমা দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর যে সুবিধা পাওয়ার কথা, তা তারা পাচ্ছে না। কারণ আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর নীতিমালা ও শর্তের ওপরে উন্নয়নশীল দেশের নিয়ন্ত্রণ খুব সামান্য। অন্যদিকে কিছু আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠানকে সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো আদিবাসী মানুষের অধিকার রক্ষায় ব্যর্থতার জন্য সমালোচনাও করে থাকে।

কিয়োটো প্রটোকল

কিয়োটো প্রটোকল হলো একটি আন্তর্জাতিক সমঝোতা, যা ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটো শহরে গৃহীত হয়। সমঝোতায় স্বাক্ষরকারী দেশগুলো স্বীকৃতি দেয় যে, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বাস্তব এবং মানবসৃষ্ট কার্বন নিঃসরণ এর অন্যতম কারণ। সমঝোতায় সই করা দেশগুলো গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ ১৯৯০ সালের মাত্রার ৫ শতাংশ নিচে নামিয়ে আনতে সম্মত হয়। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনার জন্য কিয়োটো প্রটোকলের আওতায় কিছু "নমনীয়তা কর্মকৌশল" প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মতৈক্য হয়। যেমন, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করার জন্য "সবুজ উন্নয়ন পদ্ধতি"–এর প্রবর্তন করা এবং "অভিযোজন তহবিল" গঠন করা, যা শুধুমাত্র জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য ব্যবহার করা হবে। কিয়োটো প্রটোকল কার্যকর ছিল ২০০৮ থেকে ২০১২ সালের পর্যন্ত। পরে দোহা সংশোধনীর মাধ্যমে প্রতিশ্রুতির মেয়াদকাল বৃদ্ধি করা হয়। এতে দেশগুলো ২০১৩ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ ১৯৯০ সালের মাত্রার চেয়ে ১৮ শতাংশ নামিয়ে আনার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। তবে ২০১৬

সালের জুলাই মাস পর্যন্ত কেবলমাত্র ৬৬টি দেশ এই সংশোধনীতে অনুসমর্থন দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র কিয়োটো প্রটোকলে সই করলেও দেশটির আইনসভা বা কংগ্রেস কখনোই তা অনুমোদন করেনি।

লিভারেজ বা উদ্দেশ্য সাধনের উপায়

অর্থ ব্যবস্থায় লিভারেজ হলো এমন একটি উপায়, যা একটি বিনিয়োগে লাভের সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, জলবায়ু অর্থায়নের বেলায় কোনো তহবিলের সাথে ব্যাংক ঋণ যুক্ত করার মাধ্যমে সেই তহবিলের প্রকল্পগুলোতে বাড়তি অর্থ সরবরাহ করার সক্ষমতা অর্জন করতে পারে এবং অধিক টেকসই প্রকল্প গ্রহণসহ বাড়তি অনুদান সরবরাহের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। সরকারি তহবিল থেকে অনুদান পাওয়া গেলে সেটি জলবায়ু সংক্রান্ত প্রকল্পগুলোকে বেসরকারি খাতের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলে। কারণ, তখন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঝুঁকি হ্রাস পায়। এতে করে প্রকল্পের কাজের আওতা ও সফলতা বাড়ে। তবে বেসরকারি তহবিল ব্যবহারের বিষয়টি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মাত্রা কমিয়ে দিতে পারে।

প্রশমন

প্রশমন হলো গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমিয়ে আনার চেষ্টা করা এবং বন-জঙ্গল ও সাগর ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংরক্ষণ এবং সম্প্রসারিত করার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের কার্বন শুষে নিতে সহায়তা করা। বর্তমানে জলবায়ু অর্থায়নের বেশিরভাগ অর্থই প্রশমন খাতের প্রকল্পগুলোতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবস্থার উদ্ভাবন, নিঃসৃত কার্বনকে আলাদা করে জমা রাখার প্রক্রিয়া (সিকুয়েস্ট্রেশন), গণপরিবহন ব্যবস্থায় কার্বন নিঃসরণ কমানো এবং পর্যাপ্ত বনায়ন। প্রস্তাবিত কিছু প্রশমন প্রকল্পে প্রকৃতপক্ষে কার্বন নিঃসরণ কমানোর কোনো ব্যবস্থা না থাকায় সমালোচনা ওঠেছে। যেমন, ইন্দোনেশিয়ায় কয়লাচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জাপানি প্রকল্প।

ন্যাশনাল ইপ্লিমেন্টিং এনটিটি (এনআইই) বা জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা

এনআইইগুলো হলো সে সব সংস্থা যারা জলবায়ু তহবিলের অর্থ গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। সাধারণত এনআইইগুলো সরকারি সংস্থা হয়ে থাকে। বর্তমানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকেও এনআইই হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। স্বীকৃতি বা এক্রিডিটেশন দেওয়ার বিষয়টি একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এক্রিডিটেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জলবায়ু প্রকল্প যেন অনিয়মমুক্ত থাকে সেটি নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়। এ জন্য সংশ্লিষ্ট এনআইই এর কেবল বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা থাকলেই চলে না, তাকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হয়। তাছাড়া, এনআইইগুলোর নিজস্ব নিরীক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরির সক্ষমতা, পরিবেশ ও সমাজের ওপর ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং মানবাধিকার ও লৈঙ্গিত সমতার সুরক্ষা দেওয়ার সক্ষমতা থাকতে হয়।

কার্বন অফসেট

কার্বন অফসেট হলো গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানোর পন্থা, যা কার্বন ক্রেডিট হিসেবে বিনিময় করার মাধ্যমে হয়ে থাকে। কার্বন ক্রেডিট পরিমাপের একক হল টন, যা এক টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড বা তার সমপরিমাণ অন্য কোনো গ্রিনহাউস গ্যাসের হিসাবে পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন প্রশমনমূলক কার্যক্রমের

মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা যায়। যেমন, বায়ু ও জলবিদ্যুৎ তৈরি এবং বন সংরক্ষণ করা যার মাধ্যমে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করা এবং পরিবেশবান্ধব বাড়তি উপাদান (অ্যাডিশনালিটি) যোগ করা সম্ভব। একইসাথে এই বাড়তি উপাদানটি অর্থের হিসাবে বা কার্বন ক্রেডিটের আওতায় পরিমাপযোগ্য যা ওই প্রকল্প গ্রহণ করা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব ছিল না। যে সব দেশ বা প্রতিষ্ঠান কার্বন নিঃসরণ কমানোর লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি তারা "পণ্য হিসেবে" কার্বন অফসেট কেনার মাধ্যমে নিজেদের কোটা পূরণ করতে পারে।

উন্মুক্ত ক্রয়

উন্মুক্ত ক্রয় হলো সরকারি ক্রয়ের একটি পদ্ধতি যা সরকারি-বেসরকারি ক্রয় চুক্তি সংক্রান্ত তথ্য বাধাহীন ও সময়মতো প্রবেশের অধিকার নিশ্চিত করে। সরকারি বিভিন্ন চুক্তির ক্ষেত্রে বহুভাবে দুর্নীতি ঘটে থাকে, যেমন ঘুষ গ্রহণ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব। উন্মুক্ত ক্রয়ের সারকথা হলো, ক্রয় প্রক্রিয়া যদি উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ হয়, তাহলে জলবায়ু তহবিলের প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের করদাতা এবং চুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করা অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো জবাবদিহিতার আওতায় থাকবে।

তথ্যের উন্মুক্ততা

তথ্যের উন্মুক্ততা একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তথ্যের উন্মুক্ততা কোনো তথ্য পুনরায় ব্যবহার করা এবং যে কেউ তা ব্যবহারের সুযোগ পাওয়ার অধিকারকে নিশ্চিত করে। উন্মুক্ত তথ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি হলো, এটি অবশ্যই সহজলভ্য এবং নামমাত্র মূল্যে বা বিনামূল্যে সম্পূর্ণ আকারে পাওয়া যেতে হবে। একইসাথে এটি এমন ফরম্যাটে হতে হবে যাতে তথ্য-উপাত্ত খুঁজে পাওয়া ও বিশ্লেষণ করা সহজ হয়। কারণ জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে তথ্যের উন্মুক্ততা এবং তা প্রাপ্তির বিষয়টি জনগণের কাছে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করে।

ওপেন গভর্নমেন্ট

অধিকতর স্বচ্ছতা, জনগণের চাহিদা অনুসারে যথাসময়ে সাড়া দেওয়া, জবাবদিহিতা এবং কার্যকারিতা নিশ্চিত করা হলো ওপেন গভর্নমেন্টের নীতি। ওপেন গভর্নমেন্ট বা উন্মুক্ত শাসনব্যবস্থায় বেশ কয়েকটি প্রতিশ্রুতি থাকতে হয়। যেমন, সরকারের কর্মকাণ্ডের বিষয়ে এমনভাবে তথ্য প্রকাশ করবে, যা হবে সহজে অভিগম্য, সময়োপযোগী। এছাড়া এ শাসনব্যবস্থায় জনগণকে মতামত জানানোর সুযোগ দেওয়া ও তার জবাব দেওয়া, সরকারি কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে এমন নীতিমালা প্রণয়ন, হুইসেলব্লোয়ারদের (জনগুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁসকারী) সুরক্ষা দেওয়া ও দুর্নীতি প্রতিরোধ করা এবং প্রযুক্তিগত ব্যবহার নিশ্চিতের মাধ্যমে জনগণের সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করে তথ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা থকবে।

প্যারিস চুক্তি

প্যারিস চুক্তি হলো জাতিসংঘের জলবায়ু সংক্রান্ত কাঠামো চুক্তির (ইউএনএফসিসিসি) আওতায় গৃহীত আন্তর্জাতিক চুক্তি। এটি কিয়োটো প্রটোকল থেকে ভিন্ন একটি চুক্তি যাতে স্বাক্ষরকারী ১৭৯টি দেশের জন্য কার্বন নিঃসরণের একটি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যমাত্রায় বৈশ্বিক উষ্ণতাবৃদ্ধি শিল্পবিপ্লব–পূর্ব তাপমাত্রার চেয়ে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখার কথা বলা হয়েছে। এই চুক্তিতে জলবায়ু অভিযোজনের লক্ষ্যমাত্রার একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এতে পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবস্থা ধনী দেশগুলো থেকে

দরিদ্র দেশগুলোর কাছে হস্তান্তরের জন্য অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তবে মানার জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক বা এর সহায়তার কোনো প্রতিশ্রুতি প্যারিস চুক্তিতে দেওয়া হয়নি। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশের অনুসমর্থনের প্রেক্ষিতে এই চুক্তি ২০২০ সাল থেকে কার্যকর হবে।

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+)

ইউএনএফসিসিসির আওতায় গঠিত REDD+ হলো এমন একটি পদ্ধতি, যা বনভূমিতে সঞ্চিত কার্বনকে আর্থিক পরিমাপের হিসাবে নিয়ে আসে। REDD+ এর লক্ষ্য বন ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন হ্রাস করা। আগে এর নাম ছিল REDD। এই আদ্যক্ষরগুলোর পূর্ণরূপ হচ্ছেঃ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation বা বন উজাড় ও বনের অবস্থার অবনতি রোধের মাধ্যমে সংঘটিত কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ কমিয়ে আনা। ২০০৭ সালে এই আদ্যক্ষরের সঙ্গে 'প্লাস (+)' যুক্ত করা হয়। 'প্লাস (+) মূলত বনের টেকসই ব্যবস্থাপনা, বনের কার্বনের স্টক সংরক্ষণ করা তথা আরও সম্প্রসারিত করা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

বৈশ্বিক উষ্ণতাবৃদ্ধির প্রভাব হ্রাস করতে REDD+ এর আওতায় কার্যক্রমগুলো খুবই দরকারি বলে বিজ্ঞানীরা একমত হলেও দেখা গেছে, REDD+এর কার্যক্রমগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা খুব কঠিন। অনেক বিষয় অমীমাংসিত ও বিরোধপূর্ণ রয়ে গেছে। এর মধ্যে রয়েছে কীভাবে REDD+এর আওতায় বনভিত্তিক কর্মসূচিতে অর্থায়ন করা হবে, কীভাবে এটি বন কেন্দ্রিক দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন ঠেকাবে এবং বনাঞ্চলে কার্বন স্টক পরিমাপ ও যাচাই করবে এবং পরিমাপের বাস্তবসম্মত, স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য উপায় নির্ধারণ করবে।

স্বচ্ছতা

স্বচ্ছতা হলো সরকার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা সুশীল সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় উন্মুক্ততা ও জবাবদিহিতা। সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো (যেমন, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল) শাসন ব্যবস্থায় অধিকতর স্বচ্ছতা আনতে কাজ করছে কারণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অধিকতর যাচাই-বাছাই দুর্নীতির ঝুঁকি কমায় যা জনগণের কল্যাণ বাড়ায়। জলবায়ু অর্থায়নের বেলায় এমন লক্ষ্যগুলোর অন্যতম হলো বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি ও তহবিল ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা আনয়ন। তবে পুরোপুরি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার কাজটি একটি কঠিন কাজ। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা গুলোর মধ্যে রয়েছে নথিপত্র ও সভাগুলোতে জনসাধারণের পূর্ণাঙ্গ প্রবেশাধিকার ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সীমাবদ্ধতা ও আনুষঙ্গিক ব্যয় যোগানের অনিশ্চতা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রতিযোগিতামূলক কাজের তথ্য গোপন রাখার প্রবণতা এবং প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতার কারন প্রচারের ফলে খ্যাতি বিনষ্ট হওয়ার উদ্বেগ।

জাতিসংঘ জলবায়ু সংক্রান্ত কাঠামো চুক্তি (ইউএনএফসিসিসি)

ইউএনএফসিসিসি একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, যা বায়ুমন্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ কমানোর মাধ্যমে "জলবায়ু পদ্ধতিতে মানবসৃষ্ট বিপজ্জনক হস্তক্ষেপ মোকাবেলায়" ১৯৯২ সালে সম্পাদিত হয়। ইউএনএফসিসিসির আওতাতেই ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তি গৃহীত হয়েছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি শিল্পবিপ্লব পূর্ব তাপমাত্রা থেকে ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখাই প্যারিস চুক্তির প্রধান লক্ষ্য। কার্যত প্রতিটি দেশই ইউএনএফসিসিসি প্রতিষ্ঠার

চুক্তি ও তার গভর্নিং বডির প্রতি অনুসমর্থন দিয়েছে। অগ্রগতি পর্যালোচনা ও নীতিমালা নির্ধারণের জন্য কনফারেন্স অব পার্টিজ (সিওপি বা কপ) ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি বছরই বৈঠকে বসে। ১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটো বৈঠকে কার্বন নিঃসরণের ক্ষেত্রে একটি বাধ্যতামূলক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের বিষয়ে ইউএনএফসিসিসি–এর অনুসমর্থক দেশগুলো সম্মত হয়। কিয়োটো প্রটোকলের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এই চুক্তির আওতায় জলবায়ু অর্থায়নের জন্য একটি "নমনীয়তা কর্মকৌশল" প্রতিষ্ঠার মতৈক্য হয়। "নমনীয়তা কর্মকৌশল"–এর আওতায় কোন দেশ কম কার্বন নিঃসরণ করলে সেই কম পরিমাণ নিঃসৃত কার্বনের সম পরিমান কার্বন বিশ্বের অন্য যে কোনো দেশ কার্বন বাজার থেকে কার্বন ক্রেডিটের মাধ্যমে ক্রয় করে সমপরিমাণ কার্বন নিজ দেশে নিঃসরণ করতে পারবে। এ ছাড়া ইউএনএফসিসিসির আওতায় অথবা এর সম্পূরক হিসেবে বিভিন্ন জলবায়ু তহবিল প্রতিষ্ঠা করা সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইউএনএফসিসিসি এই অর্থ উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। এসব তহবিল বৃদ্ধি পাওয়া এবং আরও বেশি অভিযোজন ও প্রশমন প্রকল্প বাস্তবায়িত হওয়ার প্রেক্ষাপটে সততা ও স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বাড়ছে।

ভ্যালু ফর মানি

ভ্যালু ফর মানি ক্রয় পদ্ধতির একটি নীতি, যা অর্থনীতির পরিমাণ, সক্ষমতা, কার্যকারিতা এবং তহবিল ব্যবহারে সমতার প্রতি ইঙ্গিত করে। ভ্যালু ফর মানি ধারণাটির অর্থ হলো, দাম ছাড়াও একটি সেবা বা পণ্যের অন্যান্য উপযোগিতা এবং তা বিতরণে সমতার বিবেচনায় অনেক সময় সবচেয়ে কম দামের সেবা বা পণ্যটি সবচেয়ে ভালো বিকল্প নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে সবচেয়ে কার্যকর সেবা ক্রয় করার মাধ্যমে অর্থের সদ্বব্যবহার করাকেই ভ্যালু ফর মানি নিশ্চিত করা বলা হয়।

যাচাই

জলবায়ু সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসহ সরকারি বা বেসরকারি প্রকল্পের নির্ভুলতা ও দক্ষতা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াকে যাচাই বলে। বিশেষ করে প্রশমন ও অভিযোজন প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। সেখানে বাইরের নিরীক্ষকরা কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে আনার বিষয়ে প্রকল্প প্রস্তুতকারী ও বাস্তবায়নকারীদের দাবিগুলো খতিয়ে দেখেন। ২০০৭ সালে কপ (কনফারেন্স অব পার্টিজ) বৈঠকে পরিমাপ, প্রতিবেদন তৈরি এবং যাচাইয়ের (এমআরভি) বিষয়ে একটি ধারণা তৈরি করা হয়। এর মাধ্যমে যাচাইয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্টমান প্রতিষ্ঠা ও স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা করা হয়েছে। এ জন্য নিয়মিত ভিত্তিতে প্রতিটি দেশকে একটি প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। তবে নাগরিক সংগঠনগুলো বিদ্যমান যাচাই কাঠামোগুলোর সমালোচনা করেছে। তাদের মতে এগুলো অসম্পূর্ণ, অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অযথার্থ।

জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে আরও তথ্য-উপাত্তের জন্য দেখুন:

http://climatemarkets.org/wp-content/uploads/2013/01/IPS-Climate Glossary.pdf

https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/annexessglossary-a-d.html

http://www.germanclimatefinance.de/overview-climate-finance/glossary/

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেলস ৪ ও ৫)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরোনো), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২-৩৩, ৪৮১১৩০৩৬
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh